বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

দশম বর্ষ □ তৃতীয় সংখ্যা □ নভ-ডিসে 1986 □ ৩ টাকা

আফ্রিকার খরা

ভূপাল
গৌতমের ডায়েরী
নারী ও বিজ্ঞান
বুদ্ধি
সাক্ষাৎকার
ডেভিড বম
চিকিৎসা
সাপের ওঝা
দূষণ
দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল
আগামী সংখ্যা
প্রযুক্তি ও সমাজ
মিসাইল ঘাঁটি

বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

নভেম্বর-ডিসেম্বর 1986 দশম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

কল

এই সংখ্যার বিষয়

1 আফ্রিকার খরা
□ নীলাঞ্জন দত্ত

6 ভূপালের ডায়েরী
□ গৌতম ব্যানার্জী

8 আধিপত্যের লড়াই
□ রাজকুমার গাঙ্গুলী
পার্থ সেন

10 অর্দ্ধেক আকাশ
□ স্বরূপ গুপ্ত

13 সাক্ষাৎকার ঃ
ডেভিড বম্
□ দীপঙ্কর হোম

15 দুর্গাপুরের দূষণ
□ শান্তনু ত্রিবেদী

19 সাপের ওঝা
□ অঞ্জন ত্রিবেদী

21 চিঠিপত্র

প্রচ্ছদ
অমিতাভ ভট্টাচার্য্য

এই সংখ্যা সম্পাদনা ও প্রকাশে
যাঁরা সহযোগিতা করেছেন
অভিজিৎ লাহিড়ী শান্তনু ত্রিবেদী
রবীন চক্রবর্তী প্রভাত মণ্ডল
সুপর্ণ চৌধুরী
এবং
লক্ষ্মী প্রেসের কর্মীবন্ধুরা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্ট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। নীচে ঠিকানা দেওয়া হল।

বিদেশের গ্রাহক এবং প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বিদেশের গ্রাহকদের বাৎসরিক চাঁদা দশ ডলার। বাংলাদেশের গ্রাহকদের জন্য ভারতীয় টাকায় বারো টাকা। প্রাতিষ্ঠানিক চাঁদা চল্লিশ টাকা। এজেন্ট কমিশন দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ।

যোগাযোগের ঠিকানা

ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী', c/o অভিজিৎ লাহিড়ী, EC 106 সল্ট লেক, কলকাতা-700064। সাক্ষাতে যোগাযোগের ব্যাপারে কিছু বিভ্রাট হচ্ছে। বহুবাজারের ঠিকানায় গিয়ে অনেকে ফিরে এসেছেন। এজন্য দুঃখিত। আপাততঃ ওই ঠিকানায় 'বি-ও-বি'র বৈঠক হচ্ছে না। পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া অবধি 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-700009 (সুকিয়া স্ট্রীটে ঢুকে)—এই ঠিকানায় সোমবার সন্ধ্যা 7 টার পর আসুন।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী যেখানে পাবেন

- □ বাসন্তী বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় (ঘোষ কেবিনের পাশে)
- □ পাল বুক স্টল—শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় (হরিদাস মোদকের মিষ্টির দোকানের পাশে)
- □ দত্ত বুক স্টল—বাগবাজার (দ্বারিক ঘোষের পাশে)
- □ পাতিরাম—কলেজ স্ট্রীট
- □ মহীন্দর বুকস্টল। কে সিং। নন্দীকিশোর (নান্কা)। সম্ভু মন্ডল। মহেন্দ্র মন্ডল। কলেজস্ট্রীট, (পাতিরামের সামনে ফুটপাতের স্টলগুলোতে)
- □ মাকালী বুকস্টল—শ্রীমানি মার্কেটের বিপরীতে বিধানসরণীতে।
- □ নোয বুক স্টল—বিধানসরণী (বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে)
- □ রানা'দার দোকান—কলেজ স্কোয়ারের উল্টো দিকে।
- □ দমদম স্টেশন। শিয়ালদহ স্টেশনের স্বপন, পঙ্কজ ও চঞ্চলের বুকস্টল
- □ অহনায়ন—গড়িয়াহাট মোড়

প্রচ্ছদ

ছবিটি মূলতঃ আফ্রিকার জুলুদের ভাস্কর্যের আদলে আঁকা। এ ধরণের ভাস্কার্য (কাঠখোদাই) ওদেশে অনাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদির প্রতীক।

দুর্ভিক্ষের মানচিত্রে আফ্রিকা

নীলাঞ্জন দত্ত

"সাহেলের ঘটনা বিজ্ঞানকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। .....খরা আর দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শুরু, এর থেকে যারা মুনাফা তোলে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই।...যে কোনো জায়গায় এবং যে কোনো সময়ে খরা ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হতে পারে। ...'বিশেষজ্ঞদের' এমনকি 'লাল বিশেষজ্ঞদের'ও, অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন!" [1]

আফ্রিকার খরা সম্পর্কে আমরা এতদিনে অনেক কিছুই জেনে গেছি। অনেক কিছু—মানে ক্ষয়ক্ষতি কতটা হয়েছে, সাহায্য কতটা জরুরী, ইত্যাদি—যা সরকারী-বেসরকারী গণমাধ্যমগুলি আমাদের জানিয়েছে। কৃষ্ণ মহাদেশের অর্ধেক জুড়ে প্রায় 15 কোটি মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটের শিকার। পশ্চিম আফ্রিকায় শস্য উৎপাদন 52% এবং শুঁটিজাতীয় খাদ্য উৎপাদন 38% কমে গেছে। 50 লক্ষ শিশু মৃত্যুর মুখে।[2] শুধু তাই নয়। দুর্ভিক্ষ মানে ব্যাপক মানুষের শেকড় ছেঁড়া। সুদানে গেছে এক লক্ষ চাদবাসী, সাত লক্ষ ইথিওপিয়াবাসী এবং আড়াই লক্ষ উগান্ডাবাসী; আরো বহু ইথিওপিয়াবাসী গেছে সোমালিয়াতে; সুদান ও সোমালিয়া থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে ইথিওপিয়ায়।[3] দুর্ভিক্ষ মানে দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যাওয়া। '82 সালের হিসেব অনুযায়ী সাহারা-নিম্নবর্তী আফ্রিকার প্রত্যেক ব্যক্তির ঘাড়ে রয়েছে 18 ডলার করে বিদেশী ঋণ; এর মধ্যে গরীব দেশগুলোতে এর পরিমাণ মাথাপিছু 44 ডলারেরও বেশী। আফ্রিকায় বিদেশী "সাহায্য" মোট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের 10% যোগায়; কোনো কোনো অতি দরিদ্র দেশে যোগায় 80% পর্যন্ত।[4]

খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিকে আজকাল আর শুধু 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়' বলা হয় না। অনেকেই বলছেন, এর পেছনে "মানুষের হাত" কাজ করে। আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ নিয়েও বহু 'বিশেষজ্ঞ' উঠে পড়ে লেগেছেন এই 'মানুষের হাতটাকে' দেখিয়ে দিতে। সবচেয়ে তারকা-শোভিত প্রকল্পটি হল 'ইনডিপেন্ডেন্ট কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিট্যারিয়ান ইস্যুস', যার মধ্যে রয়েছেন রবার্ট ম্যাকনামারা থেকে শুরু করে মহম্মদ হিদায়েতুল্লা পর্যন্ত স্বনামধন্য "নিরপেক্ষ" ব্যক্তিরা। এদের মতে, আফ্রিকায় মরুভূমি তৈরীর পেছনে রয়েছে "জ্বালানী কাঠের অনন্ত অন্বেষণে গাছকাটা, ক্ষয়িষ্ণু ঘাসের জমিতে অতিরিক্ত গোচারণ, জনসংখ্যা স্ফীতির চাপ, বিনষ্টিমূলক কৃষিপ্রথা" ইত্যাদি।[5] অর্থাৎ, দায়িত্বটা মূলত আফ্রিকার দেশগুলোর ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের। তবে এই কথাটা এত কাঁচাভাবে বলার লোক এঁরা নন। তাই তাঁরা জোর গলায় বলেছেন, দারিদ্র্যই হল এসবের মূল কারণ। সেই দারিদ্র্য দূর করার জন্য চাই "আন্তর্জাতিক সাহায্য।" শুধু তাই নয়, এতদিন পর্যন্ত যেভাবে "সাহায্য প্রকল্পগুলি" চলছিল তারও কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। "সাহায্যের" ধরণ তারা যেভাবে পাল্টাবার সুপারিশ করেছেন তার ফলাফল কী হতে পারে সে আলোচনা এখানে করার জায়গা নেই। এর প্রধান দিকগুলি হল ছোট কৃষকের অবস্থার উন্নতির দিকে নজর দেওয়া, বেসরকারী সাহায্যসংস্থাগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়া, ইত্যাদি। অনেক বেশী জটিলভাবে একই ধরণের বিশ্লেষণ করেছেন অনেক "দুর্ভিক্ষ বিশেষজ্ঞ" অর্থনীতিবিদ ও বিজ্ঞানী, যাদের মধ্যে শ্রী অমর্ত্য সেনের[6] নাম উল্লেখযোগ্য। বহু অঙ্ক কষে তিনি আবিষ্কার করেছেন, "খাদ্যের লভ্যতার ক্রমাবনতি" নয়, "খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার হারানোই" হল দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। সোজা কথায় বলতে গেলে মানুষ যখন আর খাবার কিনতে পারেনা তখনই সে না খেয়ে মরে। এত বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবীরা যে এই কথাটা এতদিন জানতেন না এটা ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে।

যাই হোক, আফ্রিকার দুর্ভিক্ষের কারণ তাহলে—প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দারিদ্র্য। পরিবেশ সত্যিই প্রতিকূল—বিশেষ করে সাহারা মরুভূমির সীমান্ত বরাবর যে 'সাহেল' (আরবী=সীমানা) অঞ্চল বিস্তৃত, সেখানে। 14°N—20°N ল্যাটিচিউড এবং 10°E—23°E লংগিচিউড জুড়ে এই এলাকার ভেতরে পড়ছে আটটি দেশের (মরিটানিয়া, সেনেগাল, মালি, আপার ভোল্টা, নাইজার, চাদ, আইভরি কোস্ট ও নাইজেরিয়া) প্রায় অর্ধেক। সাহেলের উত্তর দিকে গড় বৃষ্টিপাত 100-300mm, দক্ষিণে—যেখানে চাষ হয়—300-600mm, এই অঞ্চলটিকে 'সাহারা-নিম্ন আফ্রিকা'ও বলা হয়ে থাকে। এখানে খরা চিরন্তন। আমাদের "বিশেষজ্ঞদের" মতে এই প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরো অবনতির দিকে নিয়ে গেছে মানুষের কাজকর্ম। অবশ্য মানুষগুলো গরীব বলেই তারা স্রেফ বেঁচে থাকার জন্য এমন কতগুলো কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, এবং প্রকৃতির কতটা ক্ষতি হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পারেনি। কিন্তু এতে প্রকৃতি আরো প্রতিকূল হয়েছে এবং তাদের দারিদ্র্য আরও বেড়েছে।

সত্যিই কি ব্যাপারটা এরকম? আফ্রিকার মানুষ কি স্বেচ্ছায় নিজেদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করেছে? আর তাদের দারিদ্র্যের কারণটাই বা কী? এখানে আমাদের "বিশেষজ্ঞ"দের কলম থেমে যায়।

1910-14, 1941-43, 1968-74, 1983-86—বিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকায় খরাসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ছোবল মেরেছে বারবার। গবেষণায় দেখা গেছে, যদিও সত্যিকারের আর্দ্র আবহাওয়া সাহেল থেকে বিদায় নিয়েছে কয়েক হাজার বছর আগে, তিন-চারশ বছর আগেও কিন্তু সেই-সব জায়গায় কৃষিভিত্তিক গ্রাম ছিল, যেখানে এখন মরুভূমি। অর্থাৎ সেখানে অন্তত বার্ষিক 400m.m. বৃষ্টি হত। ভূবিজ্ঞানীরা আরো

দেখেছেন যে বর্তমান মরু অঞ্চলের কয়েকশো কিলোমিটার দক্ষিণে নতুন বালিয়াড়ি তৈরী হচ্ছে।[7]

পরিবেশবিজ্ঞানী হিউইট ও বার্টন সিদ্ধান্তে এসেছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হল প্রাকৃতিক ঘটনা এবং মানবসমাজের অবস্থার ফাংশন।[8] আফ্রিকায় মরুভূমি সৃজনের প্রক্রিয়া ছিল একটি মন্থরগতি প্রাকৃতিক ঘটনা। এটা বলবার মত যথেষ্ট প্রমান রয়েছে যে গত চারশ বছরে এই ঘটনার গতি তীব্রতর হয়েছে এবং সাহারানিম্ন আফ্রিকার গোটা পরিবেশটাই পাল্টে গিয়ে খরা ও দুর্ভিক্ষের মত বিপর্যয় তৈরী হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে এই বিপর্যয় সবচেয়ে মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছে। এটা কী করে হল, তা বোঝার জন্য আমাদের দেখতে হবে এই সময়টায় আফ্রিকার সামাজিক অবস্থায় কী পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ, প্রকৃতি বা আবহাওয়ার একান্তভাবে নিজস্ব গতিপ্রকৃতি থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

উপনিবেশ : কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

"আমি একজন কৃষিবিজ্ঞানী হিসেবে এক ইয়োরোপীয়র অধীনে চাকরী করতাম, যাকে সবাই জানতো গিনির সেরা গবেটদের একজন বলে। আমি চোখ বুজে তাকে কাজ শিখিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু সে ছিল কর্তা। এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। বিরোধটা আসলে এখানেই।"

—আমিলকার কাব্রল

আফ্রিকার সঙ্গে ইয়োরোপের "বাণিজ্যের" প্রথম চার শতক আফ্রিকায় অপবিকাশের জন্ম দিয়েছে। এই বাণিজ্যের প্রথম পণ্য ছিল মানুষ। আজকে যারা নেটিভদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে চলেছে, তাদের পূর্বসূরীরা কিভাবে দাস ব্যবসার মাধ্যমে আফ্রিকাকে জনশূন্য করেছিল দেখুন (সারণী 1)।

সারণী—1

আনুমানিক জনসংখ্যা (লক্ষে)

মহাদেশ / সাল	1650	1750	1850	1900
আফ্রিকা	100	100	100	120
ইয়োরোপ	103	144	274	423
এশিয়া	257	437	656	857

একদিকে কর্মক্ষম নারী-পুরুষ জাহাজ বোঝাই হয়ে চালান যেতে লাগলো বিদেশে, আর এক দিকে তীব্র শ্রমিক-সংকট প্রথম ধাক্কাটা দিলো আফ্রিকার কৃষিতে। এর ওপর আবার শ্বেতাঙ্গরা এসে যে জায়গাগুলোতে উপনিবেশ স্থাপন করলো, সেখানে তারা বসলো সবচেয়ে উর্বর উপত্যকায়, আর কালো মানুষরা তাড়া খেয়ে হঠে যেতে বাধ্য হলো পাহাড়ের ঢালে। শুরু হলো জমির ওপর চাপ, শুরু হলো ভূমিক্ষয়।

এরপর এলো বাগিচা-উপনিবেশের যুগ। স্থানীয় কৃষকদের বাধ্য করা হলো খাদ্যশস্যের বদলে বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে। প্রথমে এই ধরণের বাগিচা গড়ে তুলতে শুরু করে ব্রিটিশরা, তারপর অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলিও দ্রুত তাদের অনুসরণ করে। ইয়োরোপে দাস ব্যবসা তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে মন্দা যাচ্ছিলো। এই ব্যবসা থেকে হাতে যথেষ্ট টাকা জমেছিল যাদের, তারা তখন কৃষি-পণ্যের ব্যবসায় সেই টাকা খাটাতে আরম্ভ করলো। পরবর্তীকালে এরাই জন্ম দিলো আধুনিক কৃষিব্যবসায়ী (এগ্রিবিজনেস) কোম্পানীগুলির—যাদের হাতে আজো ক্রীতদাসদের রক্ত লেগে আছে। এরকম কয়েকটি কোম্পানী হলো ফরাসী 'কোঁপানী ফ্রাঁসে দাফ্রিক অক্সিদঁতেল' (সি এফ এ ও), 'সোসিয়েতে কোমাহ্‌সিয়েল কেন্ত আফ্রিকেইন' (এস সি ও এ), এবং ব্রিটিশ 'ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানী' (ইউ এ সি)।

'বাগিচা-উপনিবেশ' আফ্রিকায় আমদানী করলো এক ভয়াবহ কৃষি অর্থনীতি, থাকে বলা হয় 'মনোকালচার'। এর মানে হল একটি বা দুটি উৎপন্নের ওপর ভিত্তি করে সমগ্র কৃষিব্যবস্থা গড়ে ওঠা। এবিষয়ে আফ্রিকার সঙ্গে লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতার মিল আছে। যে কৃষিজাত দ্রব্যগুলির ওপর ভিত্তি করে মনোকালচার গড়ে ওঠে, সেগুলি অবশ্যই বাণিজ্যিক চরিত্রের। যেমন আফ্রিকায়, লাইবেরিয়ার ক্ষেত্রে তা ছিল রাবার, গোল্ড কোস্ট-এ কোকো, দাহোমি ও দক্ষিণ-পূর্ব নাইজেরিয়ায় খেজুর, সুদানে তুলো, টাঙ্গানিকায় সিসাল, উগাণ্ডায় তুলো এবং সেনেগাল আর গ্যাম্বিয়ায় বাদাম, যেখানে যথাক্রমে 85% ও 90% আয় হত এর থেকে। ভেবে দেখুন, দুটি দেশকে কার্যত বাদাম ছাড়া আর কোনো কিছুর চাষ করতেই দেওয়া হয়নি।[10]

এখানে একটি উপনিবেশবাদী প্রচারের মোকাবিলা করে নেওয়া দরকার। তা হল, এই কৃষি-উৎপন্নগুলিই আঞ্চলিক পরিবেশের সঙ্গে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ এবং স্বাভাবিক। আফ্রিকারই একজন গবেষক এই প্রচারের উত্তর দিয়েছেন[11]—"প্রত্যেক কৃষিজীবি জনগোষ্ঠীরই একটি প্রধান খাদ্য এবং কতগুলি পরিপূরক উৎপাদন থাকে। ইতিহাসবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে যে আফ্রিকার প্রাক-উপনিবেশ অর্থনীতিতে এ ধরণের বহুবিধ খাদ্য ছিল। অনেক শস্য ছিল, যেগুলি আফ্রিকা মহাদেশেই লালিত-পালিত হয়েছিল। অনেক খাদ্য ছিল (বিশেষত ফলমূল) যেগুলি মিলত বনে, এবং এশিয়া বা আমেরিকায় জন্মানো উপকারী খাদ্য-উদ্ভিদকে গ্রহণ করার ব্যাপারেও আফ্রিকানরা রক্ষণশীলতা দেখায়নি। বৈচিত্র্যময় কৃষি আফ্রিকার ঐতিহ্যেই ছিল। মনোকালচার উপনিবেশবাদীদের আবিষ্কার।"

বাগিচা উপনিবেশের মূল কথাই হল শুধুমাত্র মুনাফার দিকে তাকিয়ে কৃষি উৎপাদন করা। তাই এই অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ফসল খাদ্যশস্যকে হঠিয়ে দেয়, দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে। আফ্রিকার দেশগুলিতে প্রাক-উপনিবেশযুগের জনপ্রিয় খাদ্যশস্যগুলি কোথাও উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে, কোথাও বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্লভ, আমদানী নির্ভর, দুর্মূল্য হয়ে উঠলো। এভাবে আফ্রিকার মানুষের পুষ্টি-অর্থনীতিতে মনোকালচার নির্মম আঘাত হানলো। পুষ্টিবিজ্ঞানী জোসুয়ে দে

কাস্ত্রো দেখিয়েছেন, যেখানে যেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা বেশীদিন ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শে এসেছে, সেখানেই দেখা যায়, তাদের খাদ্য বিশেষভাবে পৌষ্টিক উপাদানগুলি থেকে বঞ্চিত।[12] আজ 'অক্সফ্যাম' থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার পর্যন্ত সবাই আফ্রিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যের আবেদন সম্বলিত পোস্টারে যে হাড় জিরজিরে শিশুটির ছবি ব্যবহার করেন, আমাদের কাছে তা আফ্রিকার শিশুটির স্বাভাবিক চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে, ঐ শিশুটি 'কোয়াশিওরকর' নামে এক অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত। যারা তার ছবি দিয়ে পোস্টার করেন তাঁরা এই তথ্যটি আমাদের জানান না, যে এই রোগ একান্তভাবেই উপনিবেশবাদের অবদান, এবং দেখা যায় সেইসব এলাকায়, যেগুলি দীর্ঘদিন উপনিবেশ ছিল।[13]

শুধুমাত্র খাদ্যশস্য উৎপাদন ধ্বংস করেই বাগিচা-উপনিবেশ ক্ষান্ত হয়নি, তা আরো দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করেছে জমিকে বন্ধ্যা করে, বন ধ্বংস করে, খরার পথ পরিষ্কার করে দিয়ে। 1947 সালে সেনেগালে বসে এক ইয়োরোপীয় পর্যবেক্ষক লিখেছিলেন: "উত্তর সেনেগালের লাউগা অঞ্চলের জমির এরমধ্যেই সর্বনাশ হয়ে গেছে। মধ্য সেনেগালে, বোয়র অঞ্চলের জমিও একই পথে যাচ্ছে। বাদাম চাষ যে ক্ষতি করেছে, বস্তুত তা সেনেগালের সীমান্তে আটকে নেই। ক্ষেতগুলোর খানিকটা অংশ চাষ করে সুদান থেকে সামান্য নগদ পয়সার আশায় যে মরশুমী কৃষি-মজুররা আসে, তারা। কিন্তু এর ফলে বর্ষার সময় সুদানে চাষের জন্য যথেষ্ট লোক থাকে না। বাদামের ব্যাপক চাষ যে আর্থিক স্বচ্ছলতার লোভ দেখায় তা ভুয়া, কারণ তা সেনেগালের কৃষির ভবিষ্যত এবং সুদানের অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট করছে।"[14]

ইয়োরোপীয়রা যে কাজ শুরু করেছিল, পরবর্তীকালে তার অংশীদার হয় আমেরিকান এবং জাপানী কোম্পানীগুলি। বিশেষত যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে 1945 থেকে '60, এই সময়ে মার্কিনী ধনবাদের নাগপাশ আফ্রিকাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলে। ডঃ বোয়ামে নক্রুমার হিসাব অনুযায়ী, '45-'58-এ আফ্রিকায় আমেরিকান ব্যক্তিগত বিনিয়োগ 1100 লক্ষ ডলার থেকে বেড়ে 7890 লক্ষ ডলারে দাঁড়ায়, যার বেশীরভাগটাই আসে মুনাফা থেকে। 1946-'59এ সরকারী তথ্য অনুযায়ী আমেরিকান কোম্পানীগুলি 12340 লক্ষ ডলার মুনাফা কামায়।[15] বলে রাখা ভাল, বিদেশী ধনবাদীরা তাদের কাজে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল পশ্চিম আফ্রিকায় লেবানীস ও সিরিয়ান, এবং পূর্ব আফ্রিকায় আরব ও ভারতীয় দালালদের সহায়তায়।

"আমেরিকাকে এখনই যুদ্ধং দেহি ভঙ্গিতে আফ্রিকায় ব্যবসায় নামতে হবে। সেখানে প্রতি এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের নতুন ব্যবসা আমারিকায় 30,000 থেকে 40,000 লোককে কাজ দেবে। আমরা যদি এখনই এই দেশগুলোর বিকাশ না ঘটাই, তাহলে অন্য কেউ তা করে ফেলবে।"[16]

—জেব্রুস লেওয়েলিন

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় বেশীরভাগ আফ্রিকান উপনিবেশ স্বাধীন হয়। আর বিদেশী সাম্রাজ্যের অধীনে না থাকলেও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক বন্ধন রয়েই গেল; তার ওপর, যে নতুন রাষ্ট্রনায়করা দেশগুলির হাল ধরলেন, তারা ঔপনিবেশিক যুগের অপবিকাশ আফ্রিকাকে যে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছিল, তা থেকে সরে আসার বিশেষ চেষ্টা করলেন না। একজন আফ্রিকান রাজনৈতিক নেতার কথায়: "প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে, সমস্ত ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলিই বিকাশের মূল দাবীগুলিকে অবহেলা করেছে; ...আমরা যেখানে ভুল করেছি তা হল, আমাদের শোষকরা যে ধারণাগুলো আমাদের কাছে চালান করেছে সেগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা। এই ধারণাগুলো সংক্ষেপে এরকম: অবিকশিত দেশে বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় রপ্তানী না বাড়ালে এবং আর্থিক সম্পদের অভাব থাকলে, আর তা আরো খারাপের দিকে যায় এই দেশগুলোর 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণের' জন্য। সমাধান দেওয়া হয় এইভাবে: রপ্তানী বাড়াও, উন্নত দেশগুলোর থেকে বেশী করে সাহায্য আর ঋণ নাও, এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ কর।"[17]

আফ্রিকান অর্থনীতিবিদ সামির আমিন দেখিয়েছেন: "আফ্রিকায় [উপনিবেশোত্তর যুগের কৃষিতে] স্থবিরতা দেখা দিয়েছে, যদিও কোনো কোনো জায়গায় কৃষিপণ্য রপ্তানী বাণিজ্যে (খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে নয়) দ্রুত বৃদ্ধি দেখা গেছে...এই এলাকাগুলিতে একাজের দ্রুত বিকাশ এবং একটি কৃষ্ণাঙ্গ গ্রামীণ ধনবাদী শ্রেণী গড়ে ওঠার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হয়।"[18]

কৃষ্ণাঙ্গ ধনীরা, যারা আফ্রিকার দেশগুলির নয়া শাসক, তারা সব-চেয়ে দ্রুত সবচেয়ে বেশী মুনাফা কামানোর পন্থা হিসাবে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানীকে বেছে নিল। "আধুনিকীকরণের" নামে "স্বাধীন" কৃষকদের বাধ্য করা হল তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন বাড়াতে। ওদিকে, সাগরপারের উপনিবেশবাদীদের কৌশলও পাল্টালো। তাদের আগে যেটুকু বিনিয়োগ করতে হত, যতটা গায়ের জোর খাটাতে হত, সবটাই এখন করতে শুরু করলো আফ্রিকান ধনিকশ্রেণী।[19] উল্টে, "সাহায্যের" মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি থেকে শুরু করে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য পর্যন্ত সবকিছু চালান করার একটা রাস্তা পেয়ে গেল। শুরু হল আফ্রিকায় নয়া উপনিবেশবাদের নিখরচায় জলযোগ।

খাদ্যের জন্য আফ্রিকার দেশগুলি আজ বিদেশের ওপর কতটা নির্ভর-শীল, তা বোঝা যাবে পরের পৃষ্ঠার সারণী 2 থেকে।[2]

একই চিত্র লাইবেরিয়া, মালাউই, মালি, মরিসাস, নাইজিরিয়া, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, তান-জানিয়া, টোগো, উগান্ডা ও জাম্বিয়ায়।

দাস ব্যবস্থার মতই, বাগিচা-উপনিবেশও বিদায় নিয়েছে। এসেছে কৃষি ব্যবসার যুগ। সাম্রাজ্যবাদী দেশের কৃষি-ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলো উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহের নামে আফ্রিকার কৃষিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বের বাজারের সঙ্গে আফ্রিকার কৃষিপণ্যের যোগাযোগ ঘটানোর কাজটাও তাদেরই মাধ্যমে হয়। একদল ভাড়াটে বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, ইত্যাদিকে এরা নিয়োগ করেছে এইসব কাজকর্মকে একটা বৈজ্ঞানিক মুখোসে ঢেকে রাখার জন্য। এদের ঔদ্ধত্বের সীমা নেই। ইথিওপিয়ার উপর্যুপরি খরায় যখন হাজার হাজার 'আফার' জনজাতীয় লোকেরা মারা যায়, তখন এরা দুনিয়ায় প্রচার করে, অতিরিক্ত গোচারণের ফলে জমিকে বন্ধ্যা করে দিয়ে তারা নাকি নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে। অথচ, 1970 সাল থেকে ডাচ কোম্পানী এইচ ভি এ এবং অন্যান্য কৃষি-ব্যবসায়ীরা ইথিওপিয়ার পরম্পরাগত গোচারণক্ষেত্র আওয়াশ উপত্যকাকে ইজারা নেওয়ার ফলেই যে গোচারণভূমি কমে গিয়ে সংকটের সৃষ্টি করেছে, এই কথাটা তাদের মুখ থেকে শোনা যায় না।[21]

সারণী 2

কয়েকটি দেশে প্রধান খাদ্য আমদানী (1972-'79)

দেশ	খাদ্য আমদানী
ক্যামেরুন	$\frac{1}{2}$ খাদ্যশস্য
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	$\frac{1}{2}$ পশু, $\frac{1}{4}$ খাদ্যশস্য
চাদ	প্রধানত চিনি ও খাদ্যশস্য
কঙ্গো	প্রায় $\frac{1}{2}$ খাদ্যশস্য
ইথিওপিয়া ('74-'77)	$\frac{3}{4}$ খাদ্যশস্য
গ্যাবোন (1975)	$\frac{1}{5}$ খাদ্যশস্য
গাম্বিয়া	খাদ্যশস্য, কিছুটা চিনি
ঘানা	$\frac{1}{2}$ খাদ্যশস্য, চিনি
আইভরি কোস্ট	খাদ্যশস্য, ডেয়ারী উৎপন্ন, চিনি
কেনিয়া	চিনি, খাদ্যশস্য

আফ্রিকার বহু দেশেই পুরোনো জনজাতীয় রীতি অনুসারে জমির ওপর যৌথ মালিকানা আধুনিককাল পর্যন্ত বজায় ছিল। সাহেলীয় দেশগুলিতে এই যৌথ জমি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করতো কৃষক ও পশুপালকরা। একটি অঞ্চলের জমিকে একবার গোচারণভূমি হিসাবে ও একবার কৃষিক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে দুই গোষ্ঠীই লাভবান হত। প্রাকৃতিক ভারসাম্যও বজায় থাকতো। "নতুন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ"-এর নামে এই পদ্ধতিকে ধ্বংস করে দিয়ে খরার রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে। এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।

মুনাফার তৈরী মরুভূমি

"খরা ও দুর্ভিক্ষ সাহেলের অপবিকাশের নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক যেমন সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান সংকটকে নিয়ন্ত্রন করছে মূল্যস্ফীতি ও অপবিকাশ।"[22]

সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় ধনিকদের মুনাফালিপ্সা আফ্রিকার ব্যাপক মানুষকে ঠেলে দিয়েছে দারিদ্র্য ও অপুষ্টির শেষ সীমায়, প্রকৃতিকে করছে বিপর্যস্ত। দেশীয় বুর্জোয়াদের আশু লাভের আশা খানিকটা পূরণ হলেও রপ্তানীনির্ভর অর্থনীতি বারবার মার খেয়েছে বিশ্ববাজারের তেজীমন্দা ও প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে। সাম্রাজ্যবাদী মূলধন সাপের মত পেঁচিয়ে ধরেছে আফ্রিকাকে। আফ্রিকান সমাজ বিজ্ঞানী মাহমুদ মামদানি মন্তব্য করেছেন: "ওয়াল্টার রডনি লিখেছিলেন যে আফ্রিকার কৃষক, উপনিবেশবাদের যুগে প্রবেশ করেছিল একখানা হাল নিয়ে, বেরিয়ে এসেছে একখানা হাল নিয়ে। তাঁর যোগ করা উচিত ছিল, ঢোকার সময় হালটা ছিল এখানকার তৈরী, আর যেটা নিয়ে সে বেরিয়ে এসেছে তা আমদানী করা।"[23]

আফ্রিকার দুর্ভিক্ষের তীব্রতা যে ক্রমশই বেড়ে চলেছে, তার ব্যাখ্যা কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে করা যায়না, করা যায় অর্থনীতির দিকে তাকালে। আফ্রিকার কৃষি-অর্থনীতি দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—যাকে আমরা বলতে পারি 'উদ্বৃত্ত-অর্থনীতি' ও 'জীবনধারণ-অর্থনীতি'। উপনিবেশের যুগ থেকে এই বিভাজন ঘটেছে। বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য রয়েছে প্রথম ক্ষেত্রে, আর খাদ্য উৎপাদন, কম মুনাফার দরুণ উপযুক্ত সহায়তার অভাবে, সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এসে পড়েছে। এতে ধনবাদীদের একটা সুবিধাও হয়েছে, কারণ, 'জীবনধারণ' ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করেও টিঁকে থাকায় (স্বাভাবিকভাবে, মানুষের বাঁচবার তাগিদে) সস্তা শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মুনাফালোভীদের মাথায় এই যুক্তিও বোধহয় ঢোকেনা। বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য বাড়াবার আশায় তারা 'জীবনধারণ' ক্ষেত্রেও ক্রমশ অনুপ্রবেশ করেছে। প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে যে সূক্ষ্ম সুতোয় কৃষিব্যবস্থার ভারসাম্য ঝুলছিল, তা ছিঁড়ে গেছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর দরজা হাট হয় খুলে গেছে।

কৃষিব্যবসার হয়েছে পোয়াবারো। ছোট্ট দেশ জাইরের উদাহরণ দেখা যাক। '60 সালে স্বাধীন হওয়ার পর PL480-র (চিনতে পারছেন ?) কৃপায় শাসকরা গম আনতে থাকে শহরের লোকের জন্য। '67-এর ভেতর রাজধানী কিনশাসায় ভুট্টা আর ম্যানিয়োক খাওয়া ভুলে গিয়ে গমই প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়ালো। এই সময় পৃথিবীর কৃষিব্যবসায়ীদের পঞ্চ-প্রধানের একটি, 'কন্টিনেন্টাল গ্রেন', প্রস্তাব করলো এক আধুনিক ময়দা-কল বসানোর। '73তে তা তৈরী হল, আমদানী করা গম আর আমেরিকান প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে। চড়চড় করে আটার দাম বাড়লো। '74-এ তামার আকরের রপ্তানী মার খাওয়ায় সরকার কন্টিনেন্টালের পাওনা মেটাতে অসুবিধায় পড়লো। '76-এর শেষদিকে কন্টিনেন্টাল মাসে মাসে জাহাজে করে যে গম আনছিল তা বন্ধ করে দিল। খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল রাজধানীতে। মনে রাখবেন, এ এমন এক খাদ্যের সংকট, যা সেখানকার লোকে খেতেই শিখেছে মাত্র বছরকয়েক। সরকারকে এমন শর্তে সমঝোতা করতে হল, যাতে জাইরের গম সংক্রান্ত

সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রন করবার অধিকার পেলো কান্টিনেণ্টাল গ্রেন। তার ওপর রয়েছে বিরাট দেনা মেটানোর প্রতিশ্রুতি।[24]

একটা প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে, যে সাম্রাজ্যবাদীরাই আজকে আবার তাহলে আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ নিয়ে এত চিন্তিত কেন? লক্ষ্য করার বিষয় হল, আগে যে রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে, তাতে এবং আরো কয়েকজন "নিরপেক্ষ" বিশেষজ্ঞদের লেখায় কৃষিব্যবসায়ীরা এবং আফ্রিকার দেশীয় শাসকরা যে দিকে বিকাশের প্রক্রিয়াকে নিয়ে যাচ্ছে, তার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের ওপর জোর দিয়ে খাদ্য উৎপাদনকে বাড়াতে হবে। এর কারণ, তারা বুঝতে পেরেছে যে মুনাফার পাহাড় শুধু হাড় দিয়ে গড়া যায় না। 'জীবনধারণ অর্থনীতিকে' পুনরুজ্জীবিত না করলে আফ্রিকায় মুনাফা শিকার বন্ধ হয়ে যাবে।

"এই পর্যায়ে, আদিম সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। খরা, একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, জন্ম দেয় ব্যাপক অনাহারের, যা হল ধনবাদী বিকাশের সঙ্গে জড়িত এক সামাজিক ঘটনা। সাহেলের খরাক্লিষ্ট মানুষদের জন্য মানবতাবাদী উদ্বেগ যেন এই তথ্যটাকে আড়াল না করে যে তারা ধনবাদী বিকাশের শিকার, এবং গণমাধ্যমগুলি যা আমাদের বিশ্বাস করাতে চায়, সেইরকম কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার নয়।"[25]

1. Jean Copans, Sahel drought : Social sciences and the political economy of underdevelopment, in K. Hewitt-ed., Interpretation of calamities, Mass., Allen & Unwin, 1983, p. 96. 2. ICIHl, Famine A Man-Made Disaster ? London, Pan Books, 1985, p. 145-46. 3. Ibid, p. 120-21. 4. Ibid, p. 9. 5. Ibid. p. 153. 6. Amartya Sen, Poverty and Famines, Oxford Clarendon Press, 1981. 7. Derek Winstanley ; Climatic changes and the future of the Sahel, in M. H. Glantz ed. The Politics of Natural Disaster, N. Y., Praeger Publishers, 1976, p. 192. 8. P. Susman, P. O' Keefe & B. Winner, Global Disasters, a radical Interpretation, in Hewitt (1983) , p. 263. 9. Waler Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, Dar es Salaam, Tanzania Publishing House, 1976, p. 106. 10. Ibid, pp. 256-57. 11. Ibid, p. 257. 12. Josue de Castro, The Geopolitics of Hunger, N. Y., M.R., 1977, p. 283. 13. Ibid. See also Rodney (1976). 14. Pierre Gourou, Les Pays Tropicaus, Paris, 1947, cited in Castro (1977), p. 384. 15. Rodney (1976) p. 213. 16. J. Bruce Llewellyn, President of the US Overseas Private Investment Corporation, speech published in OPIC's Journal , Topic/ Sep. 1979. 17. A. M. Babu, former Minister of Economic Affairs & Development Planning, Tanzania, in Postscript to Rodney (1978) p. 313. 18. Samir Amin, The dynamics and limitations of agrarian Capitalism in Black Africa, in Gutkind & Waterman ed., African Social Studies, NY, MR, 1977, p. 155. 19. Jean Suret-Canale, The forms of State Monopoly Capitalism in French-Influenced Tropical Africa, in Tricontinental, Bimonthly, Havana, No. 84, 6-82, p. 15. 20. Barbara Dinham & Colin Hines, Agribusiness in Africa, London, Earth Resources Research Ltd., 1983 p. 199. 21. Susan George, How the other half dies, U. K., Penguin, 1977, p. 241-42. 22. Jean Copans, p. Cit., op. 95. 23. Mahmood Mamdani, speech at the Uganda Red Cross Conference on Disaster Prevention at Kampala, 19 March 1985, reproduced in Third world Calling, Monthly, New Delhi, Vol. 1 No. 6, June '86, p. 33. The Speech had cost him his citizen-ship rights. 24. Dinham & Himes (1983), p. 141-42. 25. Comite d' Information Sahel, Quise Nouri de la famine en Afrique ?, Paris, Maspero, 1974, Cited in Castro (1977), p. 41. □

ভূপাল সংক্রান্ত কিছু বই

1. The Bhopal Tragedy : A report for the Citizens Commission on Bhopal. By Arun Subramanian and Ward Morehause. **Rs. 65.00.**

2. The Lessons of Bhopal : By Martin Abraham, (IOCU) Malaysia. **Rs. 110.00.**

3. The Bhopal Syndrome : By David Weir, IOCU. About potential Bhopals all over the world. **Rs. 55.00**

4. One Year After ; Appen, Malaysia, Contains original documents and reports on Bhopal. **Rs. 65.00.**

5. Mass Disaster and Multinational Liability : Carbide case in Judge Keenan's Court. **Rs. 85.00.**

নীচের ঠিকানায় লিখুন বা যোগাযোগ করুন :

1. The Bookshop, Near Civil Court, Altinho, Mapusa, 403 507, GOA.
2. Classic Books, 10, Middleton Street, Calcuta-700 071.

পুলিশ-হাজত-আদালত

ভূপালকর্মী গৌতমের অভিজ্ঞতা

গৌতম ব্যানার্জী কলকাতার ছেলে। ভূপাল গিয়েছিল আগস্টের শেষ দিকে। গ্যাস দুর্গতদের মধ্যে কাজ করবে বলে। পুলিশ এবং সরকারের চোখে কাজটি ভাল মনে হয়নি। —গর্হিত কাজ! গ্রেপ্তার হল বিজ্ঞানকর্মী গৌতম। মিথ্যে মামলায় জড়ানো হল। পীড়ন চালানো দেহ-মনের উপর। অবশেষে ছাড়া পেয়েছে শর্তাধীনে। তের দিন পর। বহু কাঠখড় পোড়ানোর শেষে। ফিরে এসে গৌতম এই অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখেছে তার ডায়েরীতে। গণতান্ত্রিক ভারতের পুলিশ-হাজত-আদালত। আপ্যায়ণের (!) বিবিধ ব্যবস্থা। অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলে ডায়েরিটি পড়তে দেয়। সাধাসিধে ঢঙে লেখা। মনে হ'ল 'বি-ও-বি'র পাঠকদের জানানো যায় সেই অভিজ্ঞতার কথা! কিছু কিছু অংশ ছাপা হল 'বি-ও-বি'র পাতায়। গৌতমের কথাতেই—

21শে আগস্ট আমি ভূপালে পেঁছিলাম। প্রথম দিন থেকেই পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে গেলাম। সকাল বেলায় বেরিয়ে যেতাম বিভিন্ন বস্তিতে। নানা ধরণের মানুষের সাথে পরিচিত হবার এবং তাদের সমস্যাগুলো জানবার চেষ্টায়। রাত্রে বসে নিউজ লেটার BGIA এর (Bhopal Group For Information & Action) জন্য খবর টাইপ করা অথবা বিস্তৃতভাবে লিখে রাখার চেষ্টা করতাম।

31শে আগস্টের স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্র ফ্রি প্রেস জার্নালে দেখলাম 2রা সেপ্টেম্বর গান্ধী মেডিকেল কলেজে Private Medical Practitionerদের একটি মিটিং ডাকা হয়েছে গ্যাসপীড়িত মানুষের চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা সমস্যা আলোচনার জন্য। সাধারণ মানুষের প্রবেশ সংক্রান্ত কোন বিধিনিষেধ উল্লেখ নেই দেখলাম।

2 সেপ্টেম্বর 1986 মঙ্গলবার

দুপুর দু'টোর সময় আমি ও অরবিন্দ পেঁছিলাম গান্ধী মেডিকেল কলেজে। অরবিন্দ সাথে টেপ রেকর্ডার ও নোটবই নিয়েছিল। আমাদের পূর্ব পরিচিত দু'একজন চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীও উপস্থিত ছিল সেখানে। যদিও সংবাদপত্রে উল্লেখ ছিল বেসরকারী চিকিৎসকদের মিটিং কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম সরকারী অনেক ডাক্তারও সেখানে রয়েছে। এবং অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ও গ্যাস পুনর্বাসন অধিকারিক ডাঃ ঈশ্বর দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করল। চা-পানের বিশ্রামের সময় দু'একজন ডাক্তার বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আমাদের পরিচয় জানতে চাইল। আমরাও খোলামনে আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলাম এবং তারা কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন জানতে চাইলাম।

মিটিংয়ের শেষ পর্বে যখন মিটিং থেকে বেরিয়ে আসছি ডাঃ ঈশ্বর দাস আমাদের পরিচয় জানতে চাইল। আমরাও যথারীতি উত্তর দিলাম। এরই মধ্যে একদল ডাক্তার হৈ চৈ করে বলতে লাগল আমরা তাদের সমস্ত আলোচনা টেপ করেছি, আমরা অনধিকার প্রবেশ করেছি, বিনা অনুমতিতে গোপনীয় সরকারী মিটিংয়ে উপস্থিত হয়েছি, ইত্যাদি। আমরা বললাম সংবাদপত্রে গোপনীয় মিটিং বলে কোন রকম উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ওরা কোন কথাই শুনল না। রেকর্ড করা ক্যাসেট এবং নোটবইয়ের পাতা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল।

5 সেপ্টেম্বর 1986 শুক্রবার

এর তিন দিন বাদে 5ই সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা নাগাদ দুজন পুলিশ এসে আমাদের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ল। দরজা খুলতেই কোন অনুমতি বা কারণ না জানিয়েই তারা ঘরে ঢুকে পড়ল এবং জেরা শুরু করল আমায়। ইতিমধ্যে বিরাট এক পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হ'ল। তার মধ্যে Adl S. P., D. I. G. (CID) ইত্যাদি পদমর্যাদার পুলিশও ছিল। তাদের একদল কোন সৌজন্যর তোয়াক্কা না করেই ঘরের সমস্ত কিছু তছনছ করতে লাগল। তখনও আমি জানিনা কি কারণে এত পুলিশ গোয়েন্দা আমার ওপর চড়াও হয়েছে। অনেকক্ষণ পরে জানলাম—ডাঃ ঈশ্বর দাস অভিযোগ করেছেন আমরা না কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ইউনিয়ন কার্বাইডের এজেন্ট! তাই এই হামলা।

পুলিশ আমাদের ঘরের দরকারী অদরকারী সমস্ত জিনিস বাজেয়াপ্ত করে নিল। এমনকি হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশীর ক্যাসেট, রবিশংকরের সেতারের ক্যাসেটও বাদ দিল না। এ সমস্তই নিল—কোন রসিদ না দিয়ে। রসিদের কথা বলায় অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে মারতে এল।

আমাকে নিয়ে গেল পুলিশ কন্ট্রোল রুমে। বড় বড় পুলিশ অফিসারেরা বসেছিল সেখানে। তারা প্রথম থেকেই আমাকে দেশদ্রোহী গুপ্তচর প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করে জেরা করতে লাগল। এরপর তানোইয়া থানায় নিয়ে গিয়ে থানা লক আপে বন্ধ করে রাখা হল। সারাদিন অভুক্ত, অস্নাত অবস্থা। তার ওপর এমন ধকল। আমি প্রায় ভেঙ্গে পড়লাম। ঘুম আসতে দেরী হল না। ঘুম ভাঙল হৈ চৈ ও লাঠির খোঁচায়।—

গৌতমের সাথে একই দিনে গ্রেপ্তার হয়েছে ডেভিড বার্গম্যান। ডেভিড এসেছে সুদূর বার্মিংহাম থেকে। সাইকেল চালিয়ে। পথে গ্যাস দুর্গতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছে। ডেভিডকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে Foreign Registration Act ভাঙ্গার দায়ে। যদিও এব্যাপারে ডেভিড অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল আগেই। পরে আবার Official Secrets Act ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় তাকে।

চোখ খুলে দেখলাম আমায় কোথায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকা হচ্ছে। তখন রাত প্রায় এগারোটা হবে বলে মনে হল। আমি মনে করলাম এত

রাত্রিতে আমাকে বোধহয় মেরে ফেলার জন্য কোন নির্জন স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। গন্তব্যস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে সঙ্গের এস· আই·-টি গালাগাল দিল এবং প্রতিবাদ করায় আচমকা আমার গলা টিপে ধরে বলল—তোকে মেরেই ফেলব।

কিছুক্ষণ বাদে কন্ট্রোল রুমে নিয়ে গেল এবং সেই পুলিশ অফিসাররা পুনরায় জেরা করল।

6 সেপ্টেম্বর 1986 শনিবার

সকালে আর একদল অফিসারের সামনে হাজির করা হল এবং যথা-রীতি জেরা চলল। নানারকম অপ্রাসঙ্গিক-প্রশ্ন করতে লাগল এবং একজন অফিসার আমার দাড়ি ধরে এত জোরে টান মারল যে আমি যন্ত্রনায় কঁকিয়ে উঠলাম। মেহেরা নামে একটি অফিসার অতি জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিত। মা-বোনেদের সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করছিল। প্রতি-বাদ করলে জুতো মারবে বলে শাসাল এবং আমার বাড়ির লোকেদের এখানে এনে হয়রান করা হবে বলে ভয় দেখাল।

9 সেপ্টেম্বর 1986 মঙ্গলবার

আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে আমার মুখে একটি নেংরা কাপড় ঢাকা দিয়ে রাখে যাতে সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফাররা আমার ছবি না তুলতে পারে। আদালতে আমায় কিছু বলতে দেওয়া হল না।

10 সেপ্টেম্বর 1986 বুধবার

এইদিন আর একবার আমাদের ঘর সার্চ করতে গেল পুলিশ। সঙ্গে আমাকেও নিল। তার আগে ডেভিড যেখানে ছিল সেখানে নিয়ে গেল। দরজায় কম্বিনেশন লক লাগানো ছিল। আমাকে বলা হল কোড নাম্বার বলতে। জানা না থাকায় একজন সি· আই· ডি· অফিসার পেছন থেকে লাথি মারল। নগ্ন করে পুলিশ কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হবে' বলে শাসাতে লাগল।

11 সেপ্টেম্বর 1986 বৃহস্পতিবার

সাত দিন পুলিশ হাজতে নরক যন্ত্রনা ভোগের পর আমাকে ফের আদালতে নিয়ে যাওয়া হল। আমাকে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দিলেন বিচারক। তবুও পুলিশ নানান অজুহাতে আমাকে সেদিন তাদের থানা হাজতেই রেখে দিল।

12 সেপ্টেম্বর 1986 শুক্রবার

এইদিন সকাল দশটা অবধি বসিয়ে রেখে তারা হাতকড়া পরিয়ে আমাকে জেল হাজতে পাঠাতে চাইল। আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলাম এই বলে যে আমি এখন আদালতের বিচারাধীন। পুলিশের এক্তিয়ার নেই হাতকড়া পড়ানোর। অবশেষে নতি স্বীকার করল ওরা। কিন্তু বিনিময়ে পায়ে হেঁটে আমাকে আসতে হ'ল দুমাইল দূরের জেল হাজতে।

জেলে এসে দেখলাম একই অবস্থা। একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। জেলের লোকটি পুলিশের মতই জেরা করতে লাগল এবং সনাক্তকরণের নামে সকাল থেকে বিকেল অবধি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে হয়রান করল। অবশেষে আমার জন্য বরাদ্দ হল পায়খানা আর প্রস্রাবাগারের পাশে দুহাত চওড়া ও চার হাত লম্বা একফালি জায়গা।

13 সেপ্টেম্বর 1986 শনিবার

দিল্লী থেকে সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবি নন্দিতা হাকসার দেখা করতে এলে তাকে দু'মিনিটের বেশী সময় দেওয়া হ'ল না।

17 সেপ্টেম্বর 1986 বুধবার

ষোল তারিখেই আমার জামিনে মুক্তির আদেশ হলেও কি একটা কারণে আমায় ছাড়া হয়নি। সতের তারিখে ছেড়ে দেওয়ার সময় জেলার আমাকে আর এক দফা জেরা করল এবং ভয় দেখাল আমাকে আবার এখানে আসতে হবে চোদ্দ বছরের জন্য।

গৌতম ফিরে এসেছে কলকাতায়। সাময়িকভাবে। আবার যেতে হবে ভূপাল। ফিরে ফিরে যেতে হবে। পুলিশ ও আদালতের হুকুম। কতদিন চলবে এই জুলুম কে জানে ? কোথা থেকে আসবে অর্থ ? স্বেচ্ছাকর্মী গৌতম নিজের শ্রমটুকু দিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল দুর্গতদের পাশে। পরিণতিতে মিলল রাষ্ট্রীয় দণ্ড ! এই আইনী জুলুমের বিরুদ্ধে বিচার চাইবে কার কাছে ?

BGIA বুলেটিন পড়ুন

এই ঠিকানায় লিখলে পাবেন। চিঠির সাথে দু'টাকা সাহায্য বাবদ পাঠাতে ভুলবেন না।

Bhopal Group for
Information & Action (BGIA)

BGIA
D42 Firdus Nagar
Bhopal 562 018

মহাকাশে আধিপত্যের লড়াই

রাজকুমার গাঙ্গুলী
পার্থ সেন

নিত্য নতুন অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি হচ্ছে। অন্যদিকে আধিপত্য বিস্তারের উদ্যোগ থেকে থাকছে না। এগিয়ে থাকার লড়াইয়ে দু'পক্ষই মরিয়া।— চুক্তি সর্বদাই পড়ে থাকছে পেছনে।

সোভিয়েত রাশিয়া কতদূর

অস্ত্র প্রতিযোগীতার দৌড়ে সোভিয়েত রাশিয়াও পিছিয়ে নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যত বেশি নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র-সীমিতকরণ চুক্তি হচ্ছে তত বেশি করে তারা শক্তি পরীক্ষার লড়াইয়ে নামছে নতুন নতুন অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হয়ে। গত তিন দশকের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগকে এভাবেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। হিরোসিমা নাগাসাকি থেকে নিকারাগুয়া মার্কিনী রাষ্ট্রনায়কদের আগ্রাসী চরিত্রের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার অস্ত্র সজ্জা সম্পর্কে-অনেকেই মনে করেন যে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। অর্থাৎ আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকে। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ উপাদানের মধ্যেও যে নিহিত আছে সমর-রাষ্ট্র হওয়ার বীজ সেদিকে তারা লক্ষ্য করেন না। সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক অতি-কেন্দ্রীকরণের ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে আমলা-তান্ত্রিক পুঁজির সৃষ্টি হয়েছে সেই সাংগঠনিক চাহিদা অনুযায়ী আধিপত্য বিস্তারের নীতি মেনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সমর-শিল্পের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। হাঙ্গেরী থেকে আফগানিস্তান এ কথাই প্রমাণ করে। এ কথা ঠিক যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘ তিন দশকের ঠান্ডা লড়াই সোভিয়েত রাশিয়ার বিদেশ ও আভ্যন্তরীণ নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে কিন্তু পূর্ব ইউরোপের এবং তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ওপর সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা নিহিত আছে সোভিয়েতের রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক দশকের মধ্যেই সোভিয়েত রাশিয়াও বৃহৎ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পূর্ব ইউরোপ ও তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। সেনাবাহিনীর গুরুত্ব শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্র থেকেই অপরিসীম। বহিঃশত্রু ও আভ্যন্তরীণ শত্রুদের রুখতে গিয়ে সেনাবাহিনী রাজনৈতিক মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় থেকে সামরিক বাহিনীর মর্যাদা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে! 1960 সাল থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায় সামরিক বাহিনীর আধিপত্য আগের তুলনায় বেড়ে যায়। স্থল-নৌ ও বিমান বাহিনীর গুরুত্ব আনকাংশ বৃদ্ধি পায়, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি-তে সমরাস্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, চীনের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে আর দেশের অভ্যন্তরে অতি-আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে থাকে। এই সময় থেকেই প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকে, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়নখাতে আগের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য খাতে যে ব্যয় হ্রাস হচ্ছে তার ফলে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে এ কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। 1960-1970 এই এক দশকে সোভিয়েত রাশিয়া ছোট, মাঝারী ও দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে পিছিয়ে ত' ছিলই না, কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়েই ছিল। কিন্তু পরবর্তী দশকে সোভিয়েত রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে না। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে অস্ত্র-সীমিতকরণ চুক্তি ও নিরস্ত্রী-করণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুক্তির বাধা-নিষেধ মর্যাদা পায় নি। কারণ, দু'দেশের নীতি নির্ধারণেই সামরিক বাহিনীর আধিপত্য উপেক্ষণীয় নয়।

অস্ত্রসীমিত করণ চুক্তি এবং SDI

1950 সালে যখন সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তঃ মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে খুব বেশি দেরি নেই তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি প্রস্তাবিত হয়। আলাপ আলোচনা চলতে চলতে 1963 সালে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মহাকাশে ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করার এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির বলে মহাকাশে কোন দেশ নিউক্লিয়ার অস্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবে না। শ'খানেক দেশ এই চুক্তিতে সই করে। কিন্তু পরবর্তীকালে দুই দেশের সমর সম্ভার প্রমাণ করে যে এই চুক্তি (Outer Space Treaty Organisation) দুই দেশই লঙ্ঘন করে। 1972 সালে SALT-I এবং 1979 সালে SALT-II চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে দুই দেশের অস্ত্র সীমিতকরণের অঙ্গীকার করা হয়। SALT-II মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন পেল না। সোভিয়েতের আফগান উপস্থিতির অছিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করে। কোন দেশই অস্ত্র সীমিত করল না বরং নতুন অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে অধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে গেল। কারুর আধিপত্য যাতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত না হয় সেই উদ্দেশ্য মাথায় রেখে অস্ত্র-সীমিত করণ চুক্তি বা নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পাদিত হ'ল। 1972 সালে দুই দেশের মধ্যে প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তি (Anti-Ballistic Missile Treaty। বা ABM Treaty) হ'ল। 1974 সালে চুক্তিটি সংশোধিত হ'ল। এই চুক্তিতে মহাকাশে প্রতিক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও ক্ষেপণাস্ত্রে

এবং মহাকাশ গবেষণায় নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোন বাধা-নিষেধ রইল না। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আন্দ্রোপভের এ বিষয়ে বক্তব্য হল:

"প্রতিক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে অস্ত্র ধ্বংস করা কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার অস্ত্রের মুখে সোভিয়েত রাশিয়াকে নিরস্ত্র করার অপপ্রয়াস"।

প্রতি উপগ্রহ বা ASAT কর্মসূচীতে মহাকাশে অস্ত্র মজুত করায় কোন বাধা নিষেধ রইল না। 1974 সালের ASAT চুক্তি আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতির জন্য স্থগিত রইল। ASAT কর্মসূচীর ফলে SALT ও ABM চুক্তির কোন বাধানিষেধ শেষ পর্যন্ত রইল না। 1981 সালের আগষ্ট মাসে সোভিয়েত রাশিয়া মহাকাশে অস্ত্র মজুত করার বিরুদ্ধে একটি খসড়া প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘে পেশ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া ঘোষণা করে যে তারা মহাকাশে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করবে যদি মার্কিনরা অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। 1984 সালের 19শে জুন সোভিয়েত রাশিয়া মহাকাশে সামরিকরণ রোধ করার জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছোট এবং মাঝারী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রও এই আলোচনার বিষয়সূচীতে থাকবে বলে দাবী করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। 1985 সালে আবার দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ক্ষীণ আশা দেখা দেয়। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি সম্পর্কে জনৈক বিশেষজ্ঞের মত:

"অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এযাবৎ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে ত' সক্ষম হয়ই নি, যুদ্ধ পরিস্থিতিও কিছু কমাতে পারেনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে সমস্ত অস্ত্রের সামরিক গুরুত্ব প্রায় নেই বললেই চলে সেই সমস্ত অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ চুক্তিভুক্ত হচ্ছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ ছাপ ফেলতে পারে এমন আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়ে গেছে।"

স্টার ওয়ার্স বা নক্ষত্র যুদ্ধের তোড়জোড়ের পর থেকেই সোভিয়েত রাশিয়া অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নক্ষত্র যুদ্ধের পরিকল্পনাকে আলাপ-আলোচনার মধ্যে আনতে নারাজ। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গোর্বাচভ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগনের কাছে এক বার্তায় ইউরোপে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কমিয়ে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি "গুরুত্বের" সাথে বিবেচনা করছেন। 1985 সালের পর থেকেই সোভিয়েত রাশিয়া যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছে তাতে নক্ষত্র যুদ্ধের পরিকল্পনা বাতিল করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নক্ষত্র যুদ্ধ নিয়ে কোন আলোচনায় যেতে রাজী নয়। জেনেভাতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে সেখানে নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজী। 1990 সালের মধ্যে ইউরোপ থেকে মাঝারী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তুলে নিতেও তারা আগ্রহী। কিন্তু নক্ষত্র যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে কোন সুবিবেচনায় আপাতত মার্কিন প্রেসিডেন্ট আগ্রহী নয়। কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ বা SDIকে নিয়ন্ত্রণের উর্দ্ধে রেখে মার্কিন প্রশাসন মহাকাশেও তাদের আধিপত্য নিশ্চিত করতে চাইছে।

এই গ্রহের মানুষ এখন গভীর বিপদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। নিউক্লিয়ার যুদ্ধের আতঙ্কের কালো ছায়া ইউরোপকে গ্রাস করেছে। মনুষ্য প্রজাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক ইউরোপের শান্তি আন্দোলনকারীদের নিরস্ত্রীকরণের জন্য 28শে এপ্রিল 1980-র আবেদনপত্র:

"পূর্ব এবং পশ্চিমের সমর নায়কদের কারো কম বা কারে বেশী অপরাধ একথা আমরা মনে করি না। দু'পক্ষই সমান দোষী বলে আমরা মনে করি। দু পক্ষই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আগ্রাসী ভূমিকা অবলম্বন করেছে।

এর প্রতিকার কেবলমাত্র আমরাই করতে পারি। আসুন আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইউরোপ ভূখন্ডকে মুক্ত করি। মুক্ত করি নিউক্লিয়ার অস্ত্রের হাত থেকে পোল্যান্ড থেকে পর্তুগাল—এই বিস্তীর্ণ ভূখন্ডকে। আসুন আমরা দুই বৃহৎশক্তিকে বাধ্য করি ইউরোপীয় ভূখন্ড থেকে নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রত্যাহার করতে। আসুন, বিশেষ করে, আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে SS-20 ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা বন্ধ করতে বলি আর মার্কিনীদের বলি ক্রুইজ আর পার্শিং মিশাইল তৈরি করা বন্ধ করতে। সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য SALT-II চুক্তি থেকে শুরু করতে বাধ্য করি আমরা দুই দেশকে।"

ইউরোপের কালো মেঘ এশিয়ার আকাশকেও আচ্ছন্ন করছে। সারা বিশ্বই এখন হাজার হাজার নিউক্লিয়ার বোমার উপর দাঁড়িয়ে আছে। মজুত অস্ত্র দিয়ে কয়েকশ' বার নিশ্চিহ্ন করা যাবে আমাদের এই গ্রহকে। পৃথিবীর মানুষকে যারা এমন বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে সেই দুই বৃহৎ শক্তির কাছে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের দাবী:

1. বিশাল অর্থব্যয় করে স্টার ওয়ার্স-1 এবং স্টার ওয়ার্স-2-এর গবেষণা না চালিয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে কি বিশ্বশান্তিকে ত্বরান্বিত করা যেত না?

2. নতুন করে নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা বন্ধ করা ছাড়া ত' স্টার ওয়ার্সের আর কোন প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। এই উন্মাদ যুদ্ধ পরিকল্পনা বাতিল করা কি বিশ্বশান্তির পক্ষে সহায়ক নয়?

3. দুই বৃহৎশক্তির অন্তর্গত ন্যাটো এবং ওয়ারশ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে মজুত অস্ত্র ধ্বংস করলে এবং সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণামূলক কেন্দ্র অবিলম্বে বন্ধ করলে বিশ্বশান্তির পক্ষে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ কি গ্রহণ করা হবে না?

যে মহাকাশে পদার্পণ ক'রে মানুষ অজানাকে জানার এক অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করেছিল সেই মহাকাশকে যুদ্ধবাজদের আধিপত্যের শিকার হতে বাধা দেওয়ার জন্য সামিল হচ্ছে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ প্রতিদিন বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। □

অর্ধেক আকাশের নক্ষত্রেরা

স্বরূপ গুপ্ত

"অর্ধেক আকাশ তুমি নারী"—দুহাত উপরে তুলে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠল অনিমেষ। স্মিতমুখে তার সামনে দু হাতে দুকাপ চা নিয়ে এগিয়ে আসে নীপা। তার পেছন থেকে আর এক কাপ চা হাতে বিজনকে দেখেই অনিমেষ আবার বলে—বাকী অর্ধেক অবশ্যই তুমি।

চা নিয়ে টেবিলে বসতে বসতে বিজন মন্তব্য করে—ইস্, একেবারে স্বয়ং মাও এলেন! নীপা বলে—মাঝে মাঝে মনে হয় মনীষীদের এসব কথা যেন নেহাৎই স্তোকবাক্য, অন্তত আমাদের এদেশে। বিবেকানন্দ, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিদ্যাসাগর সকলেই নারীকে মহীয়সী গরিয়সী করে দেখিয়েছেন, কিন্তু রোজই কাগজে দু-চারটে করে বউ-খুনের ঘটনা বেরোচ্ছে; অজানা আরও কত হ'চ্ছে কে জানে! কেন এসব হয় বলতো?

হাল্কাচালে বিজন বলে—সেরেফ বোকামী! আত্মহত্যা করে কার কী লাভ? না বনে, আলাদা হয়ে যাও! নীপার চোখমুখ দেখে মনে হ'ল বিজনের কথাগুলো সে মোটেই হাল্কাভাবে নিতে পারে নি। সে বলে—হ'তে পারে মেয়েদের বুদ্ধি কম, কিন্তু বউদের হত্যা বা আত্মহত্যা করাটা কি তার প্রমাণ?

অনিমেষ দুজনকেই নিরস্ত করার প্রয়াস পায়—তোরা দুজনেই দেখছি মেয়েদের বুদ্ধির ব্যাপারে রায় দিয়ে বসলি। এ ব্যাপারে বিজ্ঞান কি বলে?

তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করে নীপা—অতশত জানিনা, কিন্তু এইতো কিছুদিন আগে কাগজে পড়লাম আমেরিকাতে নাকি স্কুলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে গড়ে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অংকে কাঁচা, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাই, কাজেই···

তার কথা শেষ হবার আগেই অনিমেষ বিজনকে প্রশ্ন করে—আর তোর কি প্রমাণ?

—আমি পরিহাস করছিলাম; আমি মনে করি না মেয়েদের বুদ্ধি কম—বিজন নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করে—আসলে মেয়েরা স্বল্পবুদ্ধি, নিগ্রোরা নিকৃষ্ট মানুষ, এ পৃথিবীতে যে যার যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান পেয়েছে, এসব হল ক্যাপিটালিজমের শোষণের কালচার। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই, সঠিক জানিনা কবে কিভাবে কেন বিজ্ঞানীরা শোষণের রাজনীতির দোসর হয়ে এসব ধারণাকে বিজ্ঞানসম্মত করে দেখানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু এমনটা যে ঘটবে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

অনিমেষ বলে—বাঃ চমৎকার একটা লেকচার দিয়ে ফেললি দেখছি, তোর মাথা সাফ আছে। তবে কি জানিস, বিজ্ঞানের ছাত্রদের কথা বাদই দিলাম, তাদের গুরুরা এমনকি গুরুর গুরুরাও অধিকাংশই নিজেরাই এসব ভ্রান্ত ধারণার শিকার, নানাভাবে। পশ্চিমী শিল্পসমাজ এসব বিষয়ে গবেষণার জন্য অর্থ ঢালে। মনোমত সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এলে গ্রান্ট-পাওয়া বিজ্ঞানীর দল পায় পুরস্কার, সম্মান। জয়ঢাক বাজে প্রচারের, শোষক-শাসকের রাজনৈতিক স্বার্থ বজায় থাকে।····এসবের ফলে নীপার মত মেয়েরাও যারা কিনা সমাজের অগ্রগামী মেয়েবাহিনীর অঙ্গ, নিজেদের অনায়াসে স্বল্পবুদ্ধি বলে মেনে নেয়।

—এই তোমাদের দোষ, সব কিছুতেই শোষণ আর রাজনীতি এনে ফেল—নীপা যেন একটু ক্ষুব্ধ—পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা অত্যাচারিত ঠিকই, কিন্তু এর মধ্যে রাজনীতিকে টানা কেন?

—তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা কর নীপা, অনিমেষ ব্যাখ্যা করে—মেয়েদের চেয়ে যদি পুরুষদের বুদ্ধি বেশীই হয়, সমাজটা পুরুষশাসিত হওয়াটাই তো স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত, নয় কি? তোমাদের লড়াইটা কি প্রথমত ও প্রধানত পুরুষদের বিরুদ্ধে? নিশ্চয়ই নয়। সমাজটা পুরুষশাসিত, কারণ তার রাজনৈতিক তত্ত্বই অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে, পুরুষ প্রাধান্যের তত্ত্ব।

উৎসাহিত বিজনও—কাজেই সমাজ-পরিবর্তনের লড়াইকে প্রাধান্য না দিয়ে যদি শুধু পুরুষদের কাছ থেকে 'দাবী' আদায় করতে চাও তবে স্বর্ণডিম্বের আশায় হংসীকেই মেরে ফেলা হবে শুধু।

বিজনের কথার ভঙ্গীতে তিনজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

অনিমেষ বলে—কিন্তু কথা হচ্ছিল মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মতামত। তোরা কি জানিস, গত শতাব্দীতে এক সময় রীতিমতো মাপজোক করে বলা হয়েছিল যে মেয়েদের ব্রেন পুরুষদের তুলনায় গড়ে প্রায় পাঁচ আউন্স ওজনে হাল্কা এবং আকারেও ছোট!

—ওমা, তাই নাকি? প্রায় মুখ ফস্কেই শব্দ বেরোয় নীপার।

—হ্যাঁ, তাই নিয়ে রীতিমত হৈ চৈ, কোথায় কিভাবে হারালো মেয়েরা ঐ পাঁচ আউন্স ব্রেন? অবশেষে এ যুক্তির অসারতা ধরা পড়ল—গড় পুরুষের ও নারীর দেহের ওজনের অনুপাতে ব্রেনের ওজন যখন মিলিয়ে দেখা হল। এবারে আর ফারাক নেই; এমনকি কোথাও কোথাও উল্টোও হয়ে গেল! 1901 সালে অ্যালিস লেই (Alice Leigh) বিস্তৃত সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে শক্ত মত হাজির করলেন—ব্রেনের ওজনের সঙ্গে বৌদ্ধিক ক্ষমতার কোন সম্পর্ক নেই।

নীপার চোখ মুখ স্পষ্টতই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখে অনিমেষ বলে—তুমি বোধহয় অতটা খুশী ধরে রাখতে পারবে না একথা শুনলে যে এর পর মেয়েদের স্বল্পবুদ্ধির পক্ষে হাজির হল আরও শক্তপোক্ত যুক্তি প্রমাণ।

বিজন বলে বসল—সেটা নিশ্চয় মনস্তাত্ত্বিকদের সেই আই কিউ পরীক্ষা, বুদ্ধি মাপা ?

অনিমেষ—না, তা ঠিক নয়। এখন তো আই· কিউ·-এর গোটা ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পাবাজী বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু 1905 সালে আই· কিউ-এর প্রবর্তনের পর, প্রথমদিকে তার তেমন অপব্যবহার হয়নি। আর 1930-এর পর আই· কিউ· মাপার প্রশ্নমালা এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয় যে তাতে নারী পুরুষ ভেদ যেন ফুটে না ওঠে। কাজেই আই· কিউটা কোনদিনই পুরুষ প্রাধান্যের হাতিয়ার তেমন একটা হয়ে উঠতে পারেনি। বিপদ এল আরও কঠিন বিজ্ঞান (Hard Science) থেকে এবং বেশ কয়েক দশক পরে। এই শতকের ষাটের দশকে উপস্থাপিত হ'ল সেইসব নতুন ব্যাখ্যা প্রমাণ। বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞানী—বায়োকেমিষ্ট, ফিজিওলজিষ্ট, নিউরোঅ্যানাটোমিষ্ট, সাইকোলজিষ্ট, নিউরো-সাইকোলজিষ্ট, নিউরোফিজিওলজিষ্ট, নিউরো-এনডোক্রিনোলজিষ্ট, সোসিওবাইওলজিষ্ট ইত্যাদি নানা গম্ভীর সমস্ত লজিস্টরা একটা ধারণা গড়ে তুলছিলেন যে মেয়েদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আচার আচরণ অবশ্যই পুরুষদের থেকে আলাদা। এঁরা আর বুদ্ধি কম বা বেশীর কথা বলেন না, বলেন শুধু পার্থক্য, বিশেষত্বের কথা—এটা লক্ষ্যণীয়। যেমন, মেয়েরা সাধারণত অধিকতর বাকপটু ও ভাষাদক্ষ। মুখ চিনে রাখার ক্ষমতা নাকি তাদের বেশী এবং বেশী সমবেদনা ও স্নেহপ্রবণও। বিপরীতে পুরুষরা নাকি বেশী স্থানকালমাত্রাবোধসম্পন্ন ফলে গাণিতিক ও যান্ত্রিক দক্ষতা অর্জনের সম্ভাবনা তাদেরই বেশী এবং মেয়েদের তুলনায় তারা বেশী দাপটীও (aggresive)। বলা হতে লাগল যে এসব পার্থক্যের জীববৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। এই ভিত্তির অন্যতম উৎস অবশ্যই ব্রেন। ব্রেনের আকার ও ওজনের যুক্তিটা তেমন টেঁকসই হয়নি, এবার ব্রেনের আভ্যন্তরীণ গঠনে পার্থক্যের উৎস খোঁজার চেষ্টা হ'ল। যুক্তিসূত্রটা এরকম ঃ মানুষের মস্তিষ্ক তথা ব্রেন বাম ও দক্ষিণ অর্ধগোলকে মোটামুটি বিভক্ত। আর এও জানা যে বাম গোলার্দ্ধ ডান দিকের দৈহিক কার্য্যাবলী ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধ বাম দিকের দৈহিক কার্য্যাবলী মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ করে। পরীক্ষায় দেখা গেল মেয়েদের মস্তিষ্কের বাম গোলার্দ্ধ তুলনায় বড়। যেহেতু ব্রেনের বাম অর্ধে স্ট্রোক বা থ্রম্বোসিস হ'লে বাকশক্তির উপর খারাপ প্রভাব পড়ে এবং এমনকি কথা বন্ধও হয়ে যায়, অতএব যাবতীয় মেয়েলী বৈশিষ্ট্যের অবস্থান ও নিয়ন্ত্রনের উৎস হিসেবে চিহ্নিত হতে লাগল বাম গোলার্দ্ধের মস্তিষ্ক, এবং বিপরীতে দক্ষিণ গোলার্দ্ধের মস্তিষ্কই হ'ল যাবতীয় পুংবিশেষত্বের আধার ও নিয়ন্ত্রক।

নীপা বলে—বাবা, এতো গবেষণা ? গবেষকরা নিশ্চয়ই সব পুরুষ ?

এক চুমুকে কাপের চা টুকু শেষ করে অনিমেষ উত্তর দেয়—প্রায় সবাই পুরুষ ; তবে নারীর বিশেষত্ব তথা তুলনামূলক ক্ষুদ্রতার (inferiority) এই ব্যাখ্যাও শেষ পর্যন্ত ধোপে টিঁকল না। ... মস্তিষ্কের গঠনপার্থক্য দিয়ে আচরণগত পার্থক্য ধরা যায় না। সাধারণত মনুষ্যেতর প্রাণীর মস্তিষ্কের গবেষণার ভিত্তিতেই এসব ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে অন্য ইতর প্রাণীর মস্তিষ্কের বিশাল ফারাক, বিশেষত স্নায়ু কোষের সংখ্যায়, বিন্যাসে ও দেহের প্রত্যন্ত কোণে তাদের সংযোগে। কীটপতঙ্গে যেখানে লক্ষের হিসেবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ গোনা যায়, বিড়াল কি ইঁদুরে তা গুণতে। হয় কোটিতে আর মানুষের ক্ষেত্রে হাজার কোটিতে। জন্মাবার পরও মানবশিশুতে এইসব স্নায়ুকোষের সঙ্গে নিত্যনতুন যোগাযোগ গড়ে ওঠে। শিশুর পারিপার্শ্বিকতা ও অভিজ্ঞতা এসব জৈবিক পরিবর্তনে প্রচন্ড প্রভাব ফেলে। বস্তুত, জৈবিক নিয়ন্তাবাদীরা (Biological determinists) আরও "বিশ্বাসযোগ্য" গভীর উৎসের সন্ধান পেয়েছেন।

'সে আবার কী' ? বিজন ও নীপা প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করে।

সেটা হ'ল হরমোন তথা উত্তেজক গ্রন্থিরস। স্ত্রী-পুরুষের, বিশেষত নারীর, শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপে হরমোনের ভূমিকা আজ কমবেশী অনেকেরই জানা। স্টীভেন গোল্ডবার্গ 1974-এ তার বই The Inevitability of Patriarchy-তে হরমোনের ক্রিয়াকলাপকেই নারী-পুরুষের শুধু জৈবিক বিশেষত্বের নয়, আচার আচরণগত পার্থক্যেরও মূল হিসেবে দেখিয়েছেন। ভ্রূণের বিকাশের কোন এক স্তরে টেস্টোস্টেরোন নামক পুং-হরমোন এমন এক স্নায়ু-হরমোন ঘটিত পরিবর্তন সূচিত করে যাতে ভ্রূণের মস্তিষ্কটি পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়, ফলে মস্তিষ্কের ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক এই পরিবর্তনের ছাপ নিয়েই ভবিষ্যতের দাপটী পুরুষ জন্ম নেয়।

নীপা মন্তব্য করে—এতো দেখছি আমাদের নিয়তিবাদের মতই, পার্থক্য শুধু ঈশ্বরের দোহাই পাড়া আর না পাড়ায়।

অনিমেষ সায় দেয়—ঠিকই বলেছ। শেষ বিচারে, নর-নারীর পার্থক্য তাদের জিন বা বংশাণু দ্বারাই নির্ধারিত, এই হল মোদ্দা বক্তব্য ; কেননা হরমোনের ক্রিয়াকলাপ চলে জিনেরই নিয়ন্ত্রণে। কথাটা আরও বেশী বিজ্ঞানসম্মত শোনায় যদি এর সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচন তথা বিবর্তনকেও খাপ খাওয়ানো যায়। আর ঠিক সেই কাজটিই করতে চান ই· ও· উইলসন—একজন প্রখ্যাত সোশিওবাইওলজিস্ট। উইলসন ও তাঁর অনুগামীরা নতুন করে পুরুষের প্রাধান্যের তত্ত্ব হাজির করেছেন এই হালে সত্তর দশকে।....তাঁদের প্রাথমিক পরীক্ষামূলক তথ্যাদির ভিত্তি মনুষ্যেতর প্রাণীর নজির ঃ পিঁপড়েদের সমাজে "রাণীতন্ত্র" ও "দাসত্ব" আছে, বেবুন ও সিংহের গোষ্ঠীতে পুরুষপ্রাধান্য, এমনকি "হারেম"ও আছে, অতএব মানুষের সমাজেও এসব থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। অর্থাৎ মনুষ্য স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যেই এর বীজ নিহিত। মস্তিষ্কের গঠন-পার্থক্য, পুং ও স্ত্রী-হরমোন অ্যান্ড্রোজেন ও এস্ট্রোজেনের ক্রিয়াকলাপ এসব নিয়ন্ত্রিত হয় জিনে বিধৃত নিয়মে। আর এইসব জিন আবার বিবর্তনের সোপান বেয়ে— প্রয়োজনীয়, যোগ্যতম হিসেবে নির্বাচিত

হয়েছে। নিতান্ত শৈশবেও তাই ছেলেমেয়ের তফাৎ ধরা পড়ে তাদের হাসি কান্নায়, হাত পা ছোঁড়ায় এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়ায়।

বিজন বলে—তাহলে উইলসনরা বলছেন—মেয়েরা মেয়েই এবং চিরকাল তাই থাকবে এমনকি সামাজিকভাবেও এবং এটাই হ'চ্ছে সর্বোত্তম বিবর্তিত অবস্থা?

নীপা যোগ করে—তবে যে শুনি বিজ্ঞানই স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক বিভেদ ঘুচিয়ে দিচ্ছে, নারীকে মর্যাদা দিচ্ছে, শোষিত-বঞ্চিতদের লড়াই করার প্রেরণা যোগাচ্ছে? তুমি যা বলছ তাতে তো উল্টো ফল দাঁড়ায়। দোহাই অনিমেষ, পায়ের তলার মাটি এভাবে কেড়ে নিও না।

অনিমেষ হাসে, বলে—তুমিও দেখছি শোষণের কথা বলছ! না, তোমার পায়ের তলার মাটি জোগাবার বিজ্ঞানীরাও আছেন বৈকি। অসেলে বিজ্ঞানে সর্বদাই বিভিন্ন ধারার প্রবাহ চলছে, এ হ'চ্ছে অপবিজ্ঞানের এক ধারা—জোরালো কেননা মদৎ ও প্রচার পায়। গোল্ডবার্গ উইলসনদের উদাহরণ ভুল ও বিকৃত, তথ্যের বিকৃতি। মনগড়া ব্যাখ্যা ও তার বিশাল ফাঁক এসবই দেখিয়ে দিচ্ছেন গুল্ড, স্টিভেন রোজ প্রমুখরা। রোজ-কামিন-লেওনটিনের 1984-তে প্রকাশিত একটি বই—Not in our Genes-এই অপবিজ্ঞানের মুখোশ ধরে টান মেরেছে। এ ধারাও অব্যাহত।

হঠাৎ হাতঘড়িতে তাকিয়েই তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে অনিমেষ।

নীপা হাঁ, হাঁ করে ওঠে—আজ আমাদের এখানে খেয়ে যাও। তাছাড়া, আমার প্রশ্নটার জবাব পাইনি···

—কোন প্রশ্নটা?

—ঐ যে, এদেশের বউ হত্যা।

—সে আর একদিন হবে। অনিমেষকে আটকানো যায় না। □

With Best Compliments From :

FINANCE CORPORATION

1/1, VANSITTART ROW,

OPPOSITE TO TELEPHONE BHABAN

Room No. 4,

CALCUTTA-700 001

সরকারী ইঞ্জিনীয়ার আন্দোলনের একশ দিন অতিক্রান্ত

সরকারী ইঞ্জিনীয়ায়রা 'গণ-অনশন ও অবস্থান' কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে তাঁদের কর্মবিরতি আন্দোলনের শততম দিবসটি পালন করলেন 13ই নভেম্বর।

গত 6ই আগস্ট থেকে সরকারী ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের কর্ম-বিরতি একশো দিন অতিক্রম করেছে। ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের সংগঠনগুলির সমন্বয়কারী সংস্থা 'ফেটো'র নেতৃত্বে এই আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ইঞ্জিনীয়াররা, গত 1লা নভেম্বর থেকে তাঁরা 'নিয়মমাফিক কাজ' কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে এ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। Eastern Regional Federation of State Engineer's Association-এর অন্তর্ভুক্ত বারোটি রাজ্যের সরকারী ইঞ্জিনীয়াররা ফেটোর এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে অর্থ-সাহায্য পাঠিয়েছেন। দেশের প্রায় সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দাবী-গুলির মীমাংসা করার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে। কর্মবিরতির ফলে উদ্বেগ প্রকাশ করে একই অনুরোধ জানিয়েছেন রাজ্যের শতাধিক বুদ্ধিজীবী। অথচ সরকার এখনও পর্যন্ত ধর্মঘটী ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না বরং কতিপয় ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে 'অ্যাসেটে' নামে একটি পাল্টা সংগঠন তৈরী করে আন্দোলনকে ভাঙার চেষ্টা করছেন এবং তাদের সঙ্গে একই দাবীতে ইতিমধ্যেই আলোচনায় বসেছেন। সরকারের এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে রাজ্যের উন্নয়ন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সংবাদপত্রের সূত্রে প্রকাশ ক্ষতির পরিমাণ প্রতিদিন প্রায় এক কোটি টাকার মতো। আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ওপর এই ক্ষতির বোঝা দুঃসহভাবে বেড়ে যাবার আগেই সরকার এগিয়ে আসবেন এই বিরোধের নিষ্পত্তি করতে।

সম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শঙ্কর সেন দীর্ঘদিনের এই বিরোধ মীমাংসার সূত্র অনুসন্ধানের কাজে উদ্যোগী হয়েছেন। আমরা তাঁর এই উগ্যোগকে স্বাগত জানাই।

স্বাস্থ্য মেলা

8-11 জানুয়ারী 1986

নেতাজী ভবন, দুর্গাপুর-4

ডঃ কোটনিশ মেমোরিয়াল কমিটি

দুর্গাপুর শাখা

প্রসঙ্গ ঃ প্রথম এটম বোমা প্রকল্প

অধ্যাপক ডেভিড বমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক ডেভিড যোসেফ বম্ পদার্থবিজ্ঞানের জগতে একটি বিশ্ববিশ্রুত নাম। Quantum Mechanics—এ তাঁর মৌলিক কাজের কথা সবাই জানেন। তিনি ছিলেন ওপেনহাইমারের ছাত্র। এবং এই সূত্রে তিনি পরবর্তীকালে ম্যানহাটান প্রকল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েন। গত বছর তিনি অবসর নিয়েছেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়-এর Birkbeck College-থেকে। সম্প্রতি দীপঙ্কর হোম লণ্ডনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে ম্যানহাটান প্রকল্প, হিরোসিমা নাগাসাকি ইত্যাদি কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। এখানে প্রশ্নোত্তরের অনুবাদ ছাপা হল।

প্রঃ প্রিয় অধ্যাপক বম, দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে এটম বোমা প্রকল্পের সাথে আপনার সম্পর্কের কথা জানতে ইচ্ছে করে।

উঃ আমি ডক্টরেট থিসিস্-এর কাজ করি অধ্যাপক ওপেনহাইমার-এর সাথে। তখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমি তেজস্ক্রিয় বিকীরণ সংক্রান্ত নানান কাজ করি বার্কলের একাধিক গবেষণাগারে। আমার মূল কাজটি ছিল ইলেকট্রিক আর্ক-এর সাহায্যে য়ুরেনিয়াম আয়ন তৈরি। আইসোটোপ পৃথক করার একটি নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হয় এতে। এ কাজটি প্রকৃতপক্ষে পুরো ম্যানহাটান প্রকল্পেরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। আমরা প্লাজমার উপর তাত্ত্বিক গবেষণার কাজও করেছিলাম ঐ সময়।

প্রঃ আপনার সঙ্গে ওপেনহাইমার-এর এ্যাটম বোমা সম্পর্কে কোনো কথা হয়েছিল?

উঃ সরাসরি কখনো কথা হয়নি। ওপেনহাইমার যখন জার্মানী থেকে আমেরিকায় এলেন, পদার্থবিদ্ হিসেবে তাঁর খ্যাতি তখন তুঙ্গে। তিনি ছিলেন প্রচন্ড বুদ্ধিদীপ্ত। নতুন গবেষণার কাজ হয়ত সবসময় করতেন না, কিন্তু সবাইকে কাজে উদ্বুদ্ধ করে নিত্য নতুন গবেষক দল তৈরিতে তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাঁর ছাত্ররাও ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। কিছুদিন বাদে রাজনীতিতে তাঁর উৎসাহ আসে (অবশ্যই হিটলারের জন্য)। তাঁর মনে হয়েছিল, হিটলারের আক্রমণকে স্তব্ধ করতেই হবে। হিটলারের জয় মানে পশ্চিমী সভ্যতার পরিপূর্ণ বিনাশ। যখন ম্যানহাটান প্রকল্প শুরু হয়, এ্যাটম বোমা তৈরির পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এল। এবং সেটা করতে হবে হিটলারের আগেই। কম্যুনিস্ট হিসেবে খ্যাতি থাকায়, প্রথমে আমেরিকার নিরাপত্তা বাহিনী থেকে বাধা এসেছিল। কিন্তু পরে সে বাধা দূর হয়, ওপেনহাইমার ম্যানহাটান প্রকল্পে যোগ দেন। লস্ আলামসে, ম্যানহাটান প্রকল্পের প্রধান হিসেবে তাঁর কাজ ছিল অসাধারণ। সমস্ত ব্যাপারটা মাথায় রেখে, তিনি এ্যাটম বোমা প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করেন অত্যন্ত নিপুণভাবে।

প্রঃ কিন্তু আপনার কি মনে হয় না, যখন জার্মানী হার স্বীকার করেই নিল, ওপেনহাইমার-এর মত লোকেরা চাইলে, হিরোশিমা নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা ফেলা বন্ধ করা যেত?

উঃ ওপেনহাইমার-এর অবশ্য অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। দুটো ব্যাপার একটু মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত ততদিনে আমেরিকার পুরো আমলাতন্ত্র এ্যাটম বোমা প্রকল্পের সাথে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল যে, বোমা ফেলা বন্ধ করা যেত না। দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানীদের মনে হয়েছিল, আমেরিকা আর জাপানের মানুষের মঙ্গলের জন্যই, যুদ্ধটাকে যে কোন উপায়েই হোক, তাড়াতাড়ি বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া, সেই সময় এ্যাটম বোমার এরকম ভয়াবহ পরিণতির কথা আমরা বুঝতে পারি নি। আমাদের ধারণা ছিল, আমরা শুধু একটা বেশ বড় মাপের বোমা বানিয়েছি, আর কিছু না।

প্রঃ ওপেন হাইমার কি বলতেন, এ সম্পর্কে?

উঃ আমি যা বললাম, মোটামুটি এই ছিল বিজ্ঞানীদের ধারণা, ওপেনহাইমার হয়তো এ বিষয়ে আরো বেশি বুঝেছিলেন। আসলে আমরা অন্তত, এ্যাটম বোমের ভয়ংকর এই সুদূরপ্রসারী তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ক্ষতির কথা কল্পনাতেও আনতে পারিনি। ওপেনহাইমাররা হয়ত জানতেন, বিশেষত আলামগোর্ড'র (Alamogordo) পরীক্ষা-মূলক বিস্ফোরণের পরে। কিন্তু ওঁনাদের যুক্তি ছিল, অস্ত্রকে প্রকাশ্যে ব্যবহার করাই উচিৎ, গোপন রাখা আরো অন্যায়। পৃথিবীকে জানানো দরকার, আমাদের হাতে কি অস্ত্র আছে।

প্রঃ কিন্তু তাই বলে, এরকম ভয়ংকর বোমা ফেলার মাধ্যমে?

উঃ আসলে, তখন এই বোমাকে, টোকিয়োতে ফেলা সাধারণ বোমার (Fire Bomb) চেয়ে ভয়ংকর কিছু মনে হয়নি। তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির কথাও যদি বলেন, এই দুই বোমার মধ্যে তফাৎও সামান্যই। হিরোশিমাতে, অসংখ্য মানুষ মারা যান, অক্সিজেনের অভাবে। সাধারণত বোমাতেও এ ব্যাপারটা ঘটে। আর যখন বোমা ফেলা ঠিক হয়, তখন অনেকেই কিছু বলেন নি। পরে, অনেকে এর ভয়ংকর পরিণতি দেখে, সমালোচনায় মুখর হন।

প্রঃ বোমা ফেলার পর, ওপেনহাইমার-এর প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

উঃ আমি জানি না, উনি কখনো এ ব্যাপারে কোনো মত প্রকাশ করেছিলেন কিনা। দেখুন, আমেরিকাতে তাঁর বিরুদ্ধে যে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল, তার প্রধান কারণ হাইড্রোজেন বোমা

তৈরিতে তাঁর আপত্তির জন্য। উনি হাইড্রোজেন বোমার সমালোচনা করেছিলেন, প্রযুক্তিগত এবং মানবিক দুটো কারণেই। এই প্রতিবাদ না করলে, তাঁকে অত সমস্যায় পড়তে হত না। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, তাঁর সহানুভূতির জায়গাটা। এমনকি, হাইড্রোজেন বোমা প্রকল্পে বাধা দেবার জন্য, তাঁকে কম্যুনিস্ট পর্যন্ত বলা হয়েছিল। আবার অনেক আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মতে, তখন হাইড্রোজেন বোমা তৈরি খুবই প্রয়োজন। কারণ ভয় তখন রাশিয়াকে নিয়ে। এবং পরে দেখা গেল, রাশিয়ানরাও হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করে ফেলেছে, আমেরিকার পরপরই। এইসব বিজ্ঞানীদের মতে, আমেরিকা যদি হাইড্রোজেন বোমা না বানাতো, ভগবানই জানেন ভাগ্যে কি ছিল। সুতরাং, দেখুন, এইসব যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদির ব্যাপারে, কোনো সঠিক বিচার করা খুব মুসকিল।

প্রঃ আপনার কি মনে হয়, ম্যাকার্থির আমলে যে Witch Hunting চলছিল সারা দেশ জুড়ে, তারই ফলে ওপেনহাইমারকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়?

উঃ ম্যাকার্থির আমলে, এমন একটা অবস্থার সূচনা হয়েছিল, যে এটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমি আবারও বলছি, ওপেনহাইমারকে নিয়ে যত গন্ডগোলের কারণ, ওঁনার হাইড্রোজেন বোমায় আপত্তি। না হলে ওঁকে এসব ঝামেলার মধ্যে পড়তে হ'ত না। তার উপর, উনি অনেকের কাছে খুব অপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিলেন। প্রয়োজনে, ওঁনার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত রুক্ষ। উনি আমেরিকার মিলিটারী প্রশাসনের অনেককে চটিয়েছিলেন, যাঁরা ওঁর সরাসরি শত্রু হয়ে যান।

প্রঃ বিচারের সময়, ওপেনহাইমারকে অবশ্য অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সমর্থন করেছিলেন। তাছাড়া, রাশিয়ার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগের অভিযোগগুলোও তো ঠিক প্রমাণিত হয় নি।

উঃ সেটা ঠিকই। আসলে, এডউইন টেলার যেমন বলতেন, "ওপেনহাইমার আমেরিকার প্রতি বিশ্বস্ত নন—একথা ঠিক নয়। কিন্তু রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতি থাকায় হাইড্রোজেন বোমার প্রকল্পতে ওঁনার মন সায় দেয় নি।" কিন্তু টেলার, এবং মিলিটারী প্রশাসন বা রাজনৈতিক নেতাদের তীব্র আক্রমণের মুখে, এইসব বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সমর্থনও খুব কাজে আসেনি, ওপেনহাইমার-এর বিচারের সময়।

প্রঃ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ?

উঃ কিছুটা ঠিকই। বিদ্বেষ তো ছিলই। আসলে মতের অমিলই এর জন্য দায়ী। টেলার মনে করতেন, ওপেনহাইমার-এর হাইড্রোজেন প্রকল্পকে সমর্থন করা উচিত ছিল। কিন্তু ওপেনহাইমার নিজে তো সমর্থন করেনই নি, অন্যদেরও উৎসাহিত করেছিলেন লস্ আলমসে হাইড্রোজেন প্রকল্প বয়কট করার জন্য।

প্রঃ এ্যাটম বোমার এরকম ভয়ংকর পরিণতি বুঝতে পারেন নি বলে কি ওপেনহাইমারের কোনো অনুশোচনা হয়েছিল পরবর্তীকালে?

উঃ তিনি জানতেন, এর ফল খুব খারাপ হবে। কিন্তু এত যুগ ধরে, এত ভয়ংকর পরিণতি যে হবে, তা হয়ত তিনি বোঝেন নি। উনি ভেবেছিলেন, এই বোমাকে উপলক্ষ্য করে, আমেরিকা আর রাশিয়া তাদের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ন্ত্রণে ব্রতী হবে। কিন্তু ব্যাপারটি পরবর্তীকালে হয়ে গেল উল্টো, এর জন্য পরে তিনি হতাশায় ভুগতেন।

প্রঃ তার মানে, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বোমা নিয়ে, ওপেনহাইমার-এর দায়িত্ববোধ নিশ্চয়ই কিছুটা ছিল?

উঃ নিশ্চয়ই। তাঁর একটা বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ছে "পদার্থবিদরা এখন জানেন, তাঁরা কি পাপ করেছেন।" নিঃসন্দেহে, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে উনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সেইসময় যে পরিস্থিতি ছিল, অন্য কোনো বিজ্ঞানীও এ্যাটম্ বোমা তৈরীতে সামিল হ'তে বাধ্য হোতেন। আইনস্টাইন আর বোর, অবশ্য তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু তার প্রভাব ছিল সামান্যই। একটা মন্তব্য (Freeman Dyson) মনে পড়ছে—'there was a sort of Faustian element in Openheimer's attitude towards the bomb'। মনে আছে নিশ্চয়, Faust, শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করেছিল, শক্তিশালী হবার লোভে। সেই সময় পদার্থবিদ্‌রা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের হাতে কি ভীষণ শক্তি আছে, তা সবাইকে জানাতে। মিলিটারী, বা রাজনৈতিক নেতা বা ব্যবসায়ীরা বিশ্বাসই করত না—পদার্থবিদ্‌দের ক্ষমতা এতখানি। Ernest O Lawrence আমাকে বলেছিলেন, New Mexico র Alamogordo-তে যখন পরীক্ষামূলক এ্যাটম বোমা ফাটানো হয়, তদনীন্তন কমান্ডার-ইন-চীফ জেনারেল গ্রোভ্‌স সবিস্ময়ে বলে ফেললেন, বাপ্‌রে—ঐ বুড়োর দল এটা বানিয়েছে? ওরা ভাবতেই পারত না আমাদের ক্ষমতা কতদূর। বিজ্ঞানীরাও দেখাবেনই তাঁদের ক্ষমতা।

প্রঃ কিন্তু এটা খুব আশ্চর্য্যের ব্যাপার, পদার্থবিদ্‌রাও এ্যাটম বোমার তেজস্ক্রিয় বিপদ এবং সুদূরপ্রসারী ফলের কথা বোঝেন নি।

উঃ এ ব্যাপারটি কারুর মাথাতেই ছিল না। অনেক পরে, মানুষ এ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। আমরাও বুঝতে পারি, আমরা যেমন ভেবেছিলাম, ব্যাপারটি তার থেকে অনেক অনেক বেশি ভয়ংকর।

প্রঃ ওপেনহাইমারের বিচারের পর, ওঁনার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

উঃ না। আমি ততদিনে য়ুরোপ চলে গেছি। তবে আমাকে উনি পরে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। উনি অবশ্য হিরোশিমা-নাগাসাকির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন নি, সেই চিঠিতে। আমার নিজেরও বিশ্বাস, এ ছাড়া আর করার কিছু ছিল না। পারমাণবিক শক্তির ভয়ংকর প্রকাশ, কোনো না কোনো ভাবে হোতই। □

অনুবাদ ঃ সুপর্ন চৌধুরী

সায়ানাইড আর পারদ বিষে ধুঁকছে দুর্গাপুর

দুর্গাপুর কি ধীরে ধীরে ভুপাল হতে চলেছে ?

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ দপ্তরের অধীনে 1979-'81 সালের একটা সমীক্ষায় দেখা যায় যে দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট, দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড, দুর্গাপুর কেমিক্যাল লিমিটেড, হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার করপোরেশন লিমিটেড, ফিলিপ্‌স্‌ কার্বন ব্ল্যাক লিমিটেড, বার্নপুরের আয়রন এন্ড স্টীল কম্পানীর মত বড়-ছোট, সরকারী আধাসরকারী বা বেসরকারী কারখানা থেকে ক্রমাগত নির্গত সায়ানাইড যৌগ ছাড়াও, পারদ, ফেনল, সীসা, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, জিঙ্ক ইত্যাদি জীবজগতের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থসমূহ দিনের পর দিন দুর্গাপুরের জল মাটিকে করে তুলছে বিষাক্ত, বন্ধ্যা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিমনী নির্গত ধোঁয়া, অসহ্য কয়লার ছাই, নানা ধরনের জীবন বিপন্নকারী গ্যাসীয় পদার্থ—যা এখানকার মানুষকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাড়ছে দুরারোগ্য শ্বাসযন্ত্রের অসুখ, দেহত্বকের জানা-অজানা নানা ভয়ংকর রোগ। স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, বাড়ছে পেটের রুগীর সংখ্যা।

দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের বাইপ্রডাক্ট বিভাগের 5নং ড্রেন নির্গত সিঙ্গারন নামক বর্জ্যদ্রব্যে সায়ানাইডের মাত্রা ধরা পড়েছে 1.3 মি গ্রা. প্রতি লিটারে। দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেডের ক্ষেত্রে মাত্রাটা 10 মি.গ্রা. প্রতি লিটার। বার্নপুরের ইন্ডিয়ান আয়রন এ্যান্ড স্টীল ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে দামরা গ্রামের কাছে ঐ মাত্রা প্রায় 1.3 মি.গ্রা. / লিটার। আজ সকলেই বোধ হয় জানেন যে ব্যবহার্য জলে মানুষের ক্ষেত্রে সায়ানাইডের নিরাপদ মাত্রা হল প্রতি লিটারে মাত্র 0.001 মি.গ্রা। অথচ বিভিন্ন কারখানা থেকে ছাড়া বর্জ্যপদার্থের জন্য দুর্গাপুরের নিকট কৃষ্ণনগর গ্রামসংলগ্ন দামোদরের জলে ঐ সায়ানাইডের মাত্রা নিরাপদ সীমার প্রায় 23 গুণ বেশী। কালিপুর গ্রামের কাছে তামলা নালায় তা প্রায় 1000 গুণ বেশী। কৃষ্ণনগরের কাছে দামোদরে পারদের মাত্রা নিরাপদের চেয়ে বেশী। এছাড়াও ডি. এস. পির 2নং, 4নং ও 5নং ড্রেনে বিষাক্ত ফেনলের মাত্রা ধরা পড়েছে যথাক্রমে 10 মি.গ্রা., 11.6 মি.গ্রা. ও 6·6 মি.গ্রা. প্রতি লিটারে। এগুলোও নিরাপদ মাত্রার থেকে বেশ কয়েকগুণ বেশী। তামলা নালা ও দামোদর নদের সঙ্গমস্থলের থেকে 2 কি.মি দূরের জলে পারদের পরিমাণ নিরাপদ সীমার (0 0002 মি.গ্রা প্রতি লিটার) দশ গুণ, দামোদরের তলাকার মাটিতে তা 4000 গুণ বেশী।

ভুপালের ঘটনার পর আজ আমরা সকলেই জেনেছি যে সায়ানাইড দূষণে মানসিক অবসাদ, স্নায়ুতন্ত্রের নানা দুরারোগ্য জটিল অসুখ, পেটের রোগ ছাড়াও, গর্ভবতী মাতার ভ্রূণের ওপর এর ফল মারাত্মক। সায়ানাইডের বিষক্রিয়ায় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে ভুপালেই। এর বেশ কয়েকটা বৈজ্ঞানিক কারণও আজ আর অজানা নয়। হয়তো বা দুর্গাপুরেও ধীরে ধীরে জন্ম হচ্ছে জড়বুদ্ধি প্রজন্মের —যাদের অসুখ পৃথিবীর কোন সর্বাধুনিক যন্ত্রসমৃদ্ধ হাসপাতালেই, কোন বিখ্যাত চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনেই, কোনও দুর্মূল্য ওষুধেই আর কোনদিনই সারানো যাবে না। মানুষের দেহে পারদ দূষণের বিষময় ফল (মিনামাতা রোগ) সম্পর্কেও আজ অনেকেই ওয়াকিবহাল। অথচ দুর্গাপুরের প্রতিটি কারখানার কর্তৃপক্ষই আজও দূষণ দূর করার ব্যাপারে আশ্চর্যরকম উদাসীন। এসব ব্যাপারে এখানকার মানুষের, কারখানাগুলোর অধিকাংশ কর্মচারীর, নিস্পৃহতা আর গা-সহা ভাবও অবাক করার মত।

ঐ সমীক্ষায় স্পষ্টই দেখা গেছে দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের কোল ওয়াশারীর সেটলিং ট্যাঙ্কগুলো একেবারে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। শুধু এটিও নয়, ফেনল দূষণ নিবারণের জন্য নির্মিত বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন প্ল্যান্টগুলোর অধিকাংশই হয় সীমার অধিক পরিমাণে পরিত্যজ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ অথবা সম্পূর্ণ অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। ব্লাস্ট ফার্নেসের ফ্লু-গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রটাও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। দেখা গেছে বহু কারখানাতেই শ্রমিক স্বাস্থ্য নিরাপদ রাখার ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও নেই। ফলে দুর্ঘটনাজনিত অঙ্গহানি, এমনকি মৃত্যুও বহুক্ষেত্রেই ঘটেছে। কর্তৃপক্ষ কোন কোন ক্ষেত্রে আন্দোলনের চাপে কিছু কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছে মাত্র, কোথাও কোথাও এসব ব্যাপার ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে বা হচ্ছে।

অথচ কর্তৃপক্ষ এসব ব্যাপারে একটু মানবিক হলেই বহু দুর্ঘটনা এড়ান যেত। বহু কারখানাতেই আজও ভুপালের মত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও আছে যথেষ্ট। এসবই কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও দূষণ নিবারণের ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্যই প্রমাণ করে।

এসব দেখে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয় ঃ ভুপালের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত এমন কিছুই করা হয় নি, যার সাহায্যে দুর্গাপুরের মত বৃহৎ শিল্পাঞ্চলে ভুপালের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায় বা ব্যাপক মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হতে পারে।

দেশে সুস্থ শিল্পের বিকাশ হোক এটা সকলেই চায়। দুর্গাপুরের কারখানাগুলো হাজার হাজার পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে, দেশের অর্থ-নীতিতে হয়তো বা সাহায্যও করছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কারখানা কর্তৃপক্ষ অধিক লাভ আর উৎপাদনের নেশায় যা খুশী তাই করবে।

ধীরে হলেও সচেতনতা বাড়ছে

আশার কথা খুব ধীরে হলেও এখানকার মানুষের কোন কোন অংশের মধ্যে দূষণের ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে উঠেছে। কিছু বিজ্ঞান

ক্লাব, দুর্গাপুর পিপলস্ সায়েন্স ফোরাম, ডাঃ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটি (দুর্গাপুর শাখা) সহ, কিছু স্বেচ্ছাসংগঠন এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে লিফলেট, বক্তৃতা, পোস্টার প্রদর্শনী, সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে। 1983 সালের আগস্টে ওদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার বেশ কয়েকটা বিজ্ঞান সংগঠন ও পত্রিকাগোষ্ঠী দুর্গাপুরে মিলিত হয়েছিল। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সেদিন দূষণবিরোধী পোস্টার, গান সহযোগে মিছিল, স্লাইড, বক্তৃতা, আলোচনাচক্র ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছিল।

1985 সালের 17ই ডিসেম্বর দুর্গাপুর সায়েন্স ফোরাম ও ডঃ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটি যৌথভাবে ডি.এস.পি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে একটা স্মারকলিপি পাঠিয়েছে যাতে নিম্নলিখিত দাবীগুলো জানানো হয়েছে।

* কারখানাজাত ক্ষতিকর বর্জ্যপদার্থের মাত্রা সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনতে হবে। সর্বনিম্ন মাত্রায় কারখানার ধূলো ও চিমনীর ক্ষতিকর গ্যাস পরিবেশে ছাড়তে হবে।
* কারখানার মধ্যেকার দূষণের মাত্রা কোন অবস্থাতেই যেন শ্রমিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
* দূষণ নিরোধক যন্ত্রগুলো অবিলম্বে সারাতে হবে, দূষণ নিরোধক সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
* প্রতিটি কারখানার বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থের দূষণের মাত্রা, দূষণ নিরোধক ব্যবস্থা, দূষণ নিরোধক যন্ত্রগুলোর অবস্থা সম্পর্কে সকল সময়ে কারখানার কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষকে অবশ্যই জানাতে হবে।
* প্রতিটি কারখানায় দূষণ নিবারক কমিটি গঠন করতে হবে, যে কমিটিতে শ্রমিক, কারখানার সংলগ্ন এলাকার সাধারণ মানুষ, সমাজসচেতন স্বেচ্ছাসংস্থা ইত্যাদি থেকে অবশ্যই প্রতিনিধি নিতে হবে।
* নিরাপদ উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরীর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।
* শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষকে কারখানাজাত বর্জ্য পদার্থগুলো কি ধরনের ক্ষতি করতে পারে, পরিত্রাণের উপায় কি, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে।
* গ্যাস লিক জনিত দুর্ঘটনা সহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনাগুলোর পরিপূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করে, এসব দুর্ঘটনা নির্মূল করার সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করতে হবে।

এ ছাড়াও মাঝে মধ্যে কিছু অনুষ্ঠান, কিছু প্রচার অভিযান ইত্যাদির কাজ হয়েছে, হচ্ছে। জাপানের মিনামাতা বিরোধী আন্দোলন, ডেনমার্ক পশ্চিম জার্মানী সুইডেনের পরমাণু বিরোধী আন্দোলন, আমাদের দেশের চীপকো আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালী আন্দোলন আজ প্রমাণ করেছে সচেতন মানুষের প্রতিরোধে কিছু কিছু জনহিতকর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় সরকার।

1985র ডিসেম্বরের স্মারকলিপি যদিও এখনও কারখানা কর্তৃপক্ষ বা সরকারী ব্যবস্থাকে এতটুকুও নাড়াতে পারে নি, তবু হয়তো আগামী দিনে দুর্গাপুরের অধিক সংখ্যক মানুষের সক্রিয় চেষ্টা, আন্দোলন, একটা সবুজ সুন্দর দূষণমুক্ত দুর্গাপুর গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। □

শান্তনু দ্বিবেদী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অবস্থান ধর্মঘটের পথে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (কুটা)-র ডাকে শিক্ষকদের আন্দোলন চলছে গত 8 সেপ্টেম্বর থেকে। ঐ দিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সেনেট, সিন্ডিকেট, ফ্যাকালটি কাউন্সিল, বোর্ড অফ স্টাডিজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বডি বর্জন করে চলেছেন। সেই সঙ্গে চলেছে পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম বয়কট। অবশ্য তাঁরা পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

আপাতদৃষ্টিতে কুটার এই আন্দোলনের ফলে আশু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ছাত্ররা। ইতিমধ্যেই তা প্রকট হতে শুরু করছে। বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং-টেকনোলজির বিভিন্ন বিভাগের ছাত্ররা উদ্বিগ্ন। সময়মত পরীক্ষাগ্রহণ ও ফলপ্রকাশ না হলে তাঁরা অনেকেই চাকরীর জন্য দরখাস্ত করতে পারবেনা।

কিন্তু কুটা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রচারপত্র থেকে বোঝা যায় শিক্ষকরাও যথেষ্টই উদ্বিগ্ন। 1985'র ডিসেম্বরেই গোপন ব্যালটে শিক্ষকরা আন্দোলনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তারপরও তাঁরা দীর্ঘদিন আন্দোলন থেকে বিরত থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সমিতি তথা সিন্ডিকেট ও উপাচার্যের কাছে বার বার আবেদন জানান তাঁদের দাবীগুলির মীমাংসার, আলোচনার। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অবশেষে 1986'র 8 সেপ্টেম্বর থেকে তাঁরা আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছেন। দুমাস অতিক্রান্ত। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার কাগুজে আবেদন ছাড়া আর কোন পজিটিভ সাড়া মেলেনি উদ্বিগ্ন শিক্ষক সমিতি, তাই, গত 20শে নভেম্বর এসপ্ল্যানেড ইস্টে 24 ঘন্টার অবস্থান করলেন।

কুটার অন্যতম প্রধান দাবীগুলি হল : ষষ্ঠ পরিকল্পনায় অনুমোদিত পদ সহ দুই শতাধিক শূন্য শিক্ষকপদ অবিলম্বে পূরণ করা। মেধাভিত্তিক প্রকল্প অনুযায়ী শিক্ষকদের পদোন্নতির দ্রুত ও অপক্ষপাত নিষ্পত্তি, শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা, বিশ্ববিদ্যালয় আইনের যথোপযুক্ত সংস্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে একশ্রেণীর শিক্ষককে ভোটাধিকারে বঞ্চিত করে আনা সরকারী নবতম অর্ডিন্যান্সটি প্রত্যাহার। ....কোন মহল থেকেই এ পর্যন্ত বলা হয়নি যে কুটার দাবীগুলি অন্যায় বা অযৌক্তিক ; সংকীর্ণ অর্থনৈতিক বা একদেশদর্শীও বলা যায় না সেগুলিকে। তবে কেন সরকারের এত টালবাহানা ?

ইতিমধ্যে ছাত্ররাও এবিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। এস. এফ. আই.-এর লোকাল কমিটি পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন। কিছু ছাত্র শিক্ষকদের দাবী দাওয়ার ন্যায্যতা স্বীকার করে কর্তৃপক্ষকে এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার দাবীতে সই সংগ্রহ করছেন। □

ক্যালডিকট দম্পতির সঙ্গে বিজ্ঞান কর্মীদের সাক্ষাৎকার

সম্প্রতি হেলেন ক্যালডিকট এসেছিলেন কলকাতায়। বহু প্রশংসিত বই "নিউক্লিয়ার ম্যাডনেস"-এর লেখিকা। নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক এবং 1983 সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত সংগঠন ফিজিশিয়ানস ফর সোশাল রেসপনসিবিলিটি (FSR) এর ওই সময়কার প্রেসিডেন্ট। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী উইলিয়াম (বিল) ক্যালডিকট। পেশায় দু'জনই চিকিৎসক-গবেষক-শিক্ষক। চাকুরি করতেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে। এখন চাকুরি ছেড়ে দিয়েছেন। পুরো সময় সাংগঠনিক কাজে নিয়োগ করেছেন তাঁরা।

এই প্রথম ভারত ভ্রমণ। কলকাতায় এসেছেন দশই নভেম্বর। এগারো তারিখে এঁদের সাথে একটি ঘরোয়া আলোচনা সভায় বসেছিলাম আমরা কিছু বিজ্ঞান সংস্থার কর্মী বন্ধুরা। পৃথিবীর নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেন। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সংশ্লিষ্ট নানান বিষয়ে তাঁদের মতামত জানালেন।

তাঁদের ধারণা এবং আমেরিকার বহু মানুষও মনে করেন, যে কোন দিন নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। নিছক দুর্ঘটনা-ক্রমেই বেধে যেতে পারে এই যুদ্ধ। আর ইতিমধ্যেই পৃথিবী বেশ কয়েকবার এমন বিপদের মুখোমুখি হয়েও পড়েছিল। মাঝপথে ভুল ধরা পড়ায় পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে। নব উদ্ভাবিত 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম' সক্রিয় হয়ে উঠবে শত্রু আক্রমণের আভাস পাওয়ার তিন মিনিটের মধ্যেই। মিসাইল উড়বে আকাশে। — কাজটা করবে কম্পিউটার।

প্রসঙ্গক্রমে জানালেন নিউক্লিয়ার অস্ত্র সীমিতকরণের দাবী নিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের সাথে। ফিরে এসেছেন প্রচন্ড হতাশা নিয়ে। অস্ত্রের ব্যাপারে কোন আপষে রাজি নন তিনি। আর বিস্মিত হয়েছেন তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিপদ সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টের অজ্ঞতায়। তাঁদের ধারণা যুদ্ধবাজ হিসেবে হিটলারের আগে স্থান দেওয়া উচিত রেগনকে।

নিউক্লিয়ার এনার্জী সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁদের ধারণা এর প্রবক্তারা যতই চিৎকার করুন এর ভবিষ্যৎ নেই। আর্থিক দিক দিয়ে তো সুবিধের নয়ই—তার চেয়ে বড় প্রশ্ন এর সাথে জড়িত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিপদ।

হেলেন ক্যালডিকট অষ্ট্রেলিয়ার মানুষ। পড়াশোনা সেখানেই। শিশু চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন। অষ্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম খনির শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছেন অনেকদিন। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিপদ সম্পর্কে এদের কোন ধারণাই ছিল না। ক্রমে উপলব্ধি করেছেন এরা। নিরাপত্তার দাবীতে আন্দোলন সংগঠিত করেছেন পরবর্তীকালে।

হেলেন ক্যালডিকট আমেরিকায় আসেন গবেষণা ও শিক্ষকতার কাজে। এখানে এসে নিউক্লিয়ার অস্ত্র বিরোধী আন্দোলনে সামিল হন। 1980 সালে যোগ দেন ফিজিশিয়ানস ফর সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটিতে। চাকুরী ছেড়ে দেন। এই সংগঠনের তখন খুবই খারাপ অবস্থা। সারা আমেরিকা ঘুরে প্রচারে নামলেন। —তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করতে লাগলেন সাধারণ মানুষকে। 1979 সালে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র দশ। 1982 সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো বারো হাজার। পঁয়তাল্লিশটি প্রদেশে এই শাখা গড়ে উঠল।

পৃথিবীর বহু দেশে গেছেন—প্রচারের কাজে। ইওরোপের সব দেশ ছাড়াও ভিয়েতনাম ও কিউবায় গেছেন। মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে গেছেন। —একজন 'মা' হিসেবে এবং একজন শিশু চিকিৎসক হিসেবে আজকের শিশু এবং আগামী প্রজন্মের মানুষ সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগের কথা বলে বেড়াচ্ছেন সর্বত্র।

ফ্রান্সের ঘন ঘন পরীক্ষামূলক নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটানো এবং একনাগাড়ে নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটর বসিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য জানতে চাইলে উইলিয়ামের সংক্ষিপ্ত উত্তর—ফরাসীদের মাথার ঠিক নেই, —'ক্রেজি'। আর সেখানে কেন নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধছে না জানতে চাইলে বলেন—'সম্ভবতঃ ঠ্যাঙানির ভয়ে'। কারণ আন্দোলন করতে গেলেই পুলিশের ধোলাই খেতে হবে।

ভারত সম্পর্কে মন্তব্য করতে বললে জানালেন—বিশ্ব শান্তির ব্যাপারে ভারতের উপর তাদের অনেক আশা।

কলকাতার অ্যান্টিনিউক্লিয়ার ফোরাম সহ কয়েকটি বিজ্ঞান সংস্থার উদ্যোগে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের একটি সভায় তাঁরা বক্তৃতা করেন গত বারোই নভেম্বর। এর আগের দিন খড়্গপুর আই.আই.টিতে একটি সভার আয়োজন করেন সেখানকার সায়েন্স এডুকেশন গ্রুপ। □

প্রতিবেদক

পরিবেশ বিজ্ঞানী নার্ট তুঁতাভীরুন সস্ত্রীক খুন হলেন

20শে নভেম্বর 1984 থাইল্যান্ডের মাহিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ডঃ নার্ট তুঁতাভীরুন (Dr. Nart Tuntawiroon) সস্ত্রীক তাঁর অফিসে নিহত হন। তাঁর মৃত্যু বিশ্বের পরিবেশ সংরক্ষণকারী আন্দোলনের উপর এক মারাত্মক আঘাত। মূলতঃ তাঁর চেষ্টার ফলেই মেকং নদীতে এক বড় বাঁধ তৈরী আটকে যায়। অবশ্য বাঁধ বিতর্কের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

নদীপরিকল্পনা ও বড় বড় বাঁধ তৈরী নিয়ে বিতর্ক ভারতসহ পৃথিবীর এক বড় অংশে আজ প্রবল। বন্যানিয়ন্ত্রণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের স্থায়ী সুবন্দোবস্তের আশা দেখিয়ে বাঁধ বাঁধার পরিকল্পনা ও প্রকৌশল প্রধানত ঃ পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ থেকে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহে চালু করা হয়। বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আজ স্পষ্ট যে বাঁধ বাঁধার ঘোষিত উদ্দেশ্যাবলী সফল তো হয়ই নি, বরং দেশে দেশে বন্যার প্রকোপ বেড়েছে। ভারতেও প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে যে হাজার দেড়েক বাঁধ তৈরী হয়েছে সেগুলো প্রমোদভ্রমণের ভালো জায়গার বেশী খুব একটা কিছু হয় নি।

জার্মানীতে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলা হয়েছে, মিশরের নীলনদের উপত্যকার আসোয়ান বাঁধ আরো কিছু খরচ করে ভেঙে দিলে মিশরবাসী বেশী উপকৃত হবে।

আমেরিকার টেনেসী ভ্যালী পরিকল্পনার বাঁধ বিরোধী আন্দোলন চল্লিশের দশকেই ছিল। আমাদের দেশে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার (D.V.C.) বিতর্কের কথাও অনেকেরই জানা (বাঁধ পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন কপিল ভট্টাচার্য)।

ডঃ তুঁতাভীরুন কিছুদিন আগেই মাদ্রিদে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ-বাদী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে থাইল্যান্ডের বাঁধ তৈরীর ভয়ঙ্কর কুফল ব্যাখ্যা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এই বক্তব্য শুধু তাঁর দেশেই নয় সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। 1982 সালে এক বিশেষ ক্যাবিনেট মিটিং-এ কাঞ্চনবাড়ী প্রদেশের নামচোয়ানে মেকং নদীর উপর প্রস্তাবিত বাঁধের বিরুদ্ধে তিনি বিশদ বক্তব্য রাখেন। তিনি EGAT-কে (Electricity Generating Agency of Thailand) ক্যাবিনেটে ভুল রিপোর্ট দেবার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তিনি দেখান যে বৃষ্টিপাত এবং জলশক্তির সম্ভাবনা অতিরঞ্জিত করে দেখানো ছাড়াও EGAT বাঁধ তৈরীর সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবের কোন হিসাবই ধরে নি। তিনি দেখান বাঁধের জলাধার তৈরীর ফলে বিপুল জমি ও বনাঞ্চল নষ্ট হবে। নদীর নিম্নপ্রবাহ অঞ্চলে জমির উর্বরতা নষ্ট হবে এবং থাই উপসাগরে মাছ ও অন্যান্য জলসম্পদের উৎপাদন কমবে আর এর ক্ষতি সারা দেশকেই বইতে হবে। প্রচুর খনিজ সম্পদ নষ্ট হবে এবং বন্যপ্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি আরও দেখান যে বাঁধটি একটি ভূকম্পনপ্রবণ অঞ্চলে তৈরী হচ্ছে। তাঁর বক্তব্যের ফলে ক্যাবিনেট বাঁধ তৈরী স্থগিত রাখে।

তুঁতাভীরুন স্মরণ করিয়ে দেন যে জলসম্পদ ব্যবহারের সুন্দর এক ব্যবস্থার দীর্ঘ ঐতিহ্য থাইল্যান্ডের আছে, যা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় গৌরব দাবী করতে পারে। খালের মাধ্যমে সেচব্যবস্থার যে সুন্দর সনাতন ব্যবস্থা ছিল সেটা রাজকীয় সেচদপ্তরের অধীনে ছিল। বাঁধ বাঁধার যুগে জল ধরে রাখার দায়িত্ব 'EGAT' কে ছেড়ে দেওয়ার পরই কৃষিতে জলসেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে গোলমাল দেখা দিয়েছে।

পরম দুঃখের বিষয় যে ডঃ তুঁতাভীরুন আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সহযোদ্ধারা জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। □

পড়ান ও পড়ুন

- প্রগতিবার্তা
- বিজ্ঞান মনীষা
- লোকবিজ্ঞান
- অহল্যা
- উৎস মানুষ
- জ্ঞান বিচিত্রা
- মাসিক গণস্বাস্থ্য
- অন্বেষা
- পেটের অসুখ
- নিষিদ্ধ ওষুধ
- এটা কি ওটা কেন

সাপের ওঝার সাথে কিছুক্ষণ

—অঞ্জন চতুর্বেদী

নবদ্বীপ শহর থেকে মাইল চারেক দূরে বিদ্যানগর গ্রাম। চৈতন্যদেব বাল্যশিক্ষা করেন এ গ্রামের এক পাঠশালায়—যার কিছু নিদর্শন এখনও আছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এখনকার মানুষ। এর পথে বহু সংস্কার কাটিয়ে উঠেছেন স্বাভাবিক নিয়মেই। কিছু কিছু রয়ে গেছে। যার মূল্য দিতে হচ্ছে নানাভাবে আজও। এমন একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে এই প্রতিবেদন।

ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করেই বলি—জলাঞ্চল ও মাঠ-ঘাট দিয়ে ঘেরা এই গ্রামে যথেষ্ট সংখ্যায় 'মা মনসার বাহন' সাপ বাস করে। তাই সাপে কামড়ানোর ঘটনা হামেশাই ঘটে। এরকমই একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ লেখা।

ঘটনার তারিখ (সর্পাঘাত) 2. 4. 86, সময়—সন্ধ্যা।

ছেলেটির নাম—শ্রী বিশ্বনাথ দাস গ্রাম—বিদ্যানগর।

তখন সবে অন্ধকার। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর মাঠ থেকে ফেরার পথে পায়ের আঙুলে সাপ কামড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে সরাবার চেষ্টা করলে হাতের আঙুলেও কামড়ায়। অন্ধকারে সাপ চেনা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বংশপরম্পরায় সযত্নে লালিত মিথ্যে বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরিত্রাতা ওঝার দ্বারস্থ হয়। গ্রামের কয়েকটি ছেলের 'মৃদু' প্রতিবাদ চাপা দিয়ে দুজন ওঝার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু হয়। ওঝার হাত চালে, মন্ত্র বলে। আত্মীয়স্বজনরা ঠাকুরকে ডাকে। এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে গুণীনরা গোখরো সাপ কামড়েছে বলে, যদিও পরে হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ে শরীরে বোড়া সাপের বিষ। যাই হোক, ওঝার চিকিৎসা—ঘটনার রাত ও পরের দিন 3.4.86 বিকাল। ফল—তেসরা বিকেলে নবদ্বীপ হাসপাতাল, মৃত্যুর সাথে যুদ্ধরত তরুণ বিশ্বনাথ। ওঝার নাম —শ্রীরাধাগোবিন্দ মণ্ডল, গ্রাম—দক্ষিণবাটী (বিদ্যানগরের পাশে)। এ গ্রামের একমাত্র বিজ্ঞান সংগঠন 'বিজ্ঞান ভিক্ষু'র পক্ষ থেকে আমরা কয়েকজন ঐ ওঝার বাড়ী যাই। তাঁর দাওয়ায় বসে আমরা তাঁর সাক্ষাৎকার নিই।

প্রঃ কতদিন এ কাজ করছেন ?

উঃ বহু বছর।

প্রঃ সবাইকে ভাল করেছেন ?

উঃ কিছু ভাল হয়েছে, দু'একজন মারা গেছে।

প্রঃ কি দিয়ে সারান ?

উঃ ওষুধ আর মন্ত্র।

প্রঃ মন্ত্র ছাড়া ওষুধ দিয়ে ভাল হয়েছে ?

উঃ হ্যাঁ, ভাল হয়েছে।

প্রঃ ওষুধ ছাড়া শুধু মন্ত্র দিয়ে দেখেছেন ?

উঃ না, ওষুধ খাওয়াতেই হবে।

প্রঃ তাহলে ওষুধই সব, মন্ত্র টন্ত্র কিছু নয় ?

উঃ মনে হয়।

প্রঃ সাপ কামড়ালেই বিষ হয় ?

উঃ না।

প্রঃ তখন কি করেন ?

উঃ তখন একটু মন্ত্র-টন্ত্র বলে দিই।

প্রঃ কেন ?

উঃ সঙ্গের লোকজন যাতে শান্তি পায়। না হলে লোকেরা বুঝতে চায় না।

প্রঃ আচ্ছা বিদ্যানগরে গতকাল (2.4) যে ছেলেটি আপনাদের চিকিৎসার পরেও সুস্থ না হয়ে আরও বেশী অসুস্থ হল, এ সম্বন্ধে কি বলেন ?

উঃ (একটু হতভম্ভ অবস্থা) যখনই শরীর ফুলে ওঠে তখনই বুঝে নিই আমাদের দ্বারা সারানো সম্ভব নয়, হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলি।

প্রঃ হাসপাতালই যখন শেষ ভরসা আপনাদের কাছেও, তখন প্রথমেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত নয় কি ?

উঃ না নিয়ে গেলে আমরা কি করবো। শুধু একটু ফুঁ, আর একটু শেকড় খাওয়ানোর ওপর ভরসা করে বসে থাকলে আমরা কি করবো বলুন।

প্রঃ ওঝা বিদ্যায় আপনাদেরও যখন ভরসা নেই, তাহলে শুধু শুধু যান কেন ?

উঃ মানুষ ঠেকে শেখে। এতদিন ভাল হয়েছে দেখেছে—যখন দেখবে ভাল হ'ল না তখনই হাসপাতালে যাবে।

প্রঃ আচ্ছা, আপনাকে যদি একটা বিষাক্ত সাপ কামড়ে ভালমত বিষ ঢালে, তাহলে আপনার চিকিৎসা কি ওঝা বিদ্যায় করবেন ?

উঃ না, তা কেন ?

প্রঃ কি করবেন ?

উঃ হাসপাতালে যাব। সেখানে বাঁচিতো বাঁচবো, মরিতো মরবো।

প্রঃ 'কালে কেটেছে' ব্যাপারটা কিরকম ?

উঃ যারা ভাল হয়, তাদের শরীরে ঠিকমত বিষ যায় না। তাছাড়া দেখেন, মানুষের শরীরের নিজের একটা বিষ নষ্ট করার ক্ষমতা আছে। যাদের শরীরে যথেষ্ট বিষ যায় তাদের সারানো

আমাদের সাধ্যের বাইরে—তখনই বলে দিই 'কালে কেটেছে'।

যাই হোক, এখন আবার আপাততঃ রোগীর কথায় ফিরে যাই।

7 তারিখ সকাল, নবদ্বীপ হাসপাতাল রোগীকে অতি সত্বর কলকাতার বড় হাসপাতাল পি. জি. তে নিয়ে যেতে বলে। আত্মীয়-স্বজন ভীত বিহ্বল। তাদের মধ্যে বহুদিন ধরে গড়ে ওঠা ধারণা—কলকাতা হাসপাতালে জানাশোনা ছাড়া জায়গা পাওয়া যায় না—তাই ঐরকম লোক খুঁজতে থাকে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত 100 কিমি রাস্তা পাঁচ ঘন্টায় ট্রেনে অতিক্রম করে সন্ধ্যে 6টা নাগাদ পি. জি. হাসপাতাল পেঁছানো গেলেও জায়গা মেলে না। সর্বশরীর ফুলে যাওয়া রোগীকে নিয়ে ওখান থেকে নীলরতন হাসপাতালে রাত 9টা নাগাদ ভর্ত্তি করা যায়। রোগীর হাসপাতালে একটু জায়গা মিললো এটাই তখন পরম পাওয়া। ছেলেটি দিন কতক পর সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে আসে ঠিকই কিন্তু 'কর্মপিউটার ভারত' তার হাতের একটা আঙুলের ওপর গরুর গাড়ীর যুগেরও বহু পূর্বের 'ওঝা চিকিৎসা'র নিদর্শন ঢাকতে পারে নি। সারা জীবন বিশ্বনাথ তার একটা আঙ্গুলকে হারিয়ে বেঁচে থাকবে, অথচ তাকে খেটেও খেতে হবে। চিকিৎসকদের মতে—ঐ সাপকামড়ানো আঙুলে ওঝাদের ভুল বাঁধন ওখানে 'dry gangrene' হতে সাহায্য করেছে।

এ ঘটনার পর আমরা ওঝা চিকিৎসার বিপক্ষে প্রচার চালাই, গ্রামের ছোট্ট বাজারের মধ্যে দেওয়াল পত্রিকার সর্প সংখ্যা প্রকাশ করি। এসবের একটা প্রভাব গ্রামের বাসিন্দাদের ওপর পড়ে। বর্তমানে সাপে কামড়ালে সরাসরি হাসপাতালেই যায়, আমাদের ছেলেরা এ ব্যাপারে সাহায্য করে। দু'এক ক্ষেত্রে ওঝার কাছে গেলেও দু'একজন ওঝা আর তাদের চিকিৎসা করে না বা করতে সাহস করে না—হাসপাতালেই নিয়ে যেতে বলে। জুলাই মাসের শেষের দিকে বাজারের মধ্যে 'পিঠে থালা' লাগিয়ে রোগ সারাবার চেষ্টা করলে কয়েকজন গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ করে এবং তা বন্ধও হয়।

আমরা ওঝা রাধাগোবিন্দবাবুর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, তাঁর মতে—মানুষ যদি বৈজ্ঞানিকভাবে সচেতন না হয়, তাহলে এরকমই ঘটবে। মানে মানুষ আরও মরবে। ওষুধই সব, মন্ত্রতন্ত্র বুজরুকি। সুতরাং সেখানে হাসপাতাল ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুযোগ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ, সুস্থতার পরিচয়। ভাবার প্রয়োজন ঝাড়ফুঁক, তেলপড়া, জলপড়া, মন্ত্রতন্ত্র, সঙ্গে একটু আধটু ওষুধ (কখনও সামনে, কখনও গোপনে) প্রয়োগ—এসবের দ্বারা চিকিৎসা কেন সৃষ্টি হয়েছিল? বহুশত বছর পূর্বের ব্যাপার। সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা, ডাক্তারি শাস্ত্রের উন্নতি, প্রয়োজনীয় হাসপাতাল ছিল না, তাই একরকম বাধ্য হয়েই মানুষ এ সমস্ত টুকিটাকি চিকিৎসার ভরসা করত। যদিও দারিদ্র্যও এর একটা অন্যতম কারণ। আজ একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের মুখে ভাবা দরকার এসব চিকিৎসার কতখানি প্রয়োজন। অবশ্য একথা এখানে স্বীকার করে নিতেই হয়, যে সাপে কাটা লোকের চিকিৎসা মূলত: হয় শহরে। সাপ থাকে গ্রামে, চিকিৎসালয় চন্দননগর, বর্ধমান, কলকাতাতে। কি অদ্ভুত পরিকল্পনা। যত দ্রুত মানুষের মন থেকে পচা গলা বাজে বিশ্বাস দূর করা যাবে, উন্নত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুযোগ পেঁছে দেওয়া যাবে, সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানোর জন্যে মানুষ সোচ্চার হবে—ততই মঙ্গল। □

INDIAN PHYSICAL SOCIETY

2 & 3, Raja Subodh Mullick Road,
Calcutta-700 032

Announcement

The Second Biren Roy Trust Lacture of Indian Physical Society is likely to be held in the month of February, 1987. The lecturer is given a silver medal and honorarium of Rs. 2500. Last year Prof. U. R. Rao, chairman, space commission, gave the first lecture which was well attended and highly acclaimed.

SECRETARY

চিঠিপত্র

"করকে দেখা" প্রসঙ্গে সৌমেন গুহর চিঠির জবাবে

বি-ও-বি'তে (মার্চ-এপ্রিল ও মে-জুন '86 সংখ্যা) মুদ্রিত "করকে দেখা····" প্রসঙ্গে শ্রীসৌমেন গুহ'র চিঠির (জুলাই-আগষ্ট '86) জন্যে ধন্যবাদ। নির্বিকার ঔদাসিন্যের চেয়ে যে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়াই প্রতিবেদক হিসেবে আমার কাছে অধিকতর কাম্য। প্রতিবেদন দুটি যে অন্তত সবার ক্ষেত্রে ঘুমের ওষুধের কাজ করে নি, এতেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করি।

সৌমেনের চিঠিতে, অভিযোগ, কটূক্তি ও বিদ্রূপের যে বান ডেকেছে কয়েকবার তাঁর চিঠিটিকে পড়েও তার কোন যথার্থ্য খুঁজে পাওয়া গেল না। তাঁর যুক্তিপ্রণালী সত্যিই বিচিত্র। দু'একটা নমুনা ঃ

(1) "করকে দেখা যুদ্ধোত্তর পশ্চিমের 'গ্রাম্য বিজ্ঞান' আন্দোলনের সামান্যও ইতিবাচক দিককে রাখতে পারে না"—অন্য কোন বিশেষ আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ ইতিবাচক দিকগুলিকে রাখার কোন প্রতিশ্রুতি আমার প্রতিবেদনে ছিল বলে তো মনে হয় না। "করকে দেখার" নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিতেই সে চলেছে। না কী সৌমেন মনে করেন যেহেতু 'একলব্য' ডিমের ঐ বিশেষ পরীক্ষাটা তাঁর "ভাল লাগা" (আমাদেরও জেনে ভাল লাগল) একটি পুস্তক থেকে "হুবহু" গ্রহণ করেছে (যে স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিতের ছবি তিনি তাঁর সারণীতে দিয়েছেন তাতে "হুবহু" হয় কি করে বোঝা মুস্কিল। অবশ্য তিনি যদি আলোচনাংশ বাদ দিয়ে শুধু 'করে' যাওয়া অংশটি বুঝিয়ে থাকেন তো আলাদা কথা) সেহেতু ঐ পুস্তকের গোটা পরিপ্রেক্ষিত গ্রহণ করাটা বাধ্যতামূলক ? জ্ঞানের রাজত্বে এ ধরনের বাঁধুয়া মজদুরের সম্পর্ক কবে থেকে চালু হয়েছে জানি না। এ ধরনের যে কোন প্রচেষ্টার মতই "করকে দেখা···" অন্য আরও যে সব অসংখ্য সূত্রের কাছে ঋণী তাদের সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতগুলিকেও তবে তাদের এক সাথে জায়গা করে দিতে হয়। এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে না পারলে তাঁদের "বদলে" ("সাড়ম্বরে" বা অনাড়ম্বরে) নেওয়ার 'অভিযোগ'-এ অভিযুক্ত হতে হয়। এ ধরনের 'অভিযোগ' কে ঠাট্টা হিসেবে ধরে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া পরিপ্রেক্ষিত ব্যাপারটা ঠিক বাজারী পণ্য নয় যে ইচ্ছে করলেই তাদের যে কোন এক প্রস্থকে আমরা বেছে নিতে পারি। মূর্ত্ত পরিস্থিতির মূর্ত্ত বিশ্লেষণ ছাড়া বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতকে বিমূর্ত্ত ভাবে পাশাপাশি শুধু উপস্থিত মাত্র তাকে "তুলনা" বলে না বা তা থেকে কোন তুলনা হয় না।

(2) যেহেতু তাবৎ বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও অন্যান্য চাকুরেরা চাকরীর প্রথম সাক্ষাৎকারের ডাক পান "মার্কসীট" ও "সোর্সের" জোরে, "পাণ্ডিত্যের" জোরে নয় (মোটের উপর দ্বিমত পোষন করি না) অতএব সৌমেন এর মতে এঁদের "দর্শন" ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার অধিকার নেই। তেমন অনধিকার চর্চাকারীদের উদ্দেশে সৌমেন বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন—"যাঁরা এখন দর্শন নিয়েও ভাবছেন"। এঁদের ডিগ্রী ও চাকরীর প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বনের জবরদস্ত প্রচারক তিনি। মানুষের মনের রহস্য সত্যিই অতলান্ত !

তাঁর অন্যমনস্কতা (উত্তেজনার আধিক্য বশতই সম্ভবত) তাঁকে মাঝে মাঝে নানা কৌতুকপ্রদ গোলমালে নিয়ে ফেলেছে। যেমন ঃ

(1) মাঝে মাঝেই তিনি বয়স্ক শিক্ষা এবং শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন। ঐ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত আলোচনার পুরোটাই ছিল শিশু ও কিশোর বিদ্যার্থীদের উপযুক্ত নিয়মিত শিক্ষাক্রম নিয়ে। কাজেই "কৃষকদের স্বনির্ভর শিক্ষা", "মধ্য প্রদেশের গ্রামের মানুষদের" সাধারণ ভাবে কি শেখান উচিত ইত্যাদি সংক্রান্ত তাঁর অন্যতর মতামত যদি সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্যও হয় (এ সম্পর্কে পরে বলছি) তাতে আলোচ্য কার্যক্রমের সার্থকতা বা অসার্থকতা কোনটাই আপনা আপনি প্রমাণিত হয় না। ঐ সব ক্ষেত্রে "একলব্যে"র যে কার্যক্রমের কথা আমরা জেনেছিলাম চাক্ষুষ পরিচয়ের অভাবে সে সম্পর্কে কোন কথা বলি নি। অন্যদিকে শিশু ও কিশোরদের জন্য যে পুস্তক রচনা করা হয়েছিল সেই পুস্তক যদি তাদের সাথে তাঁদের বাবা মা'দেরও উৎসর্গ করা হয়, এবং যেখান থেকে (অর্থাৎ গাঁ) এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তার বিশেষ উল্লেখ থাকে তবে তাঁর যে কেন "খুব খারাপ" লাগল তা বোঝা মুস্কিল। আর প্রেরণা'র "নিদর্শনের" কোন বাঁধা তালিকা আছে কি ?

(2) "U.G.C-র মোটা মাইনে দিয়ে একজন চাষীকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিশ্রাম কক্ষে বসিয়ে রাখা হয়—সারাদিন সে প্রাণের বিকাশ কেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে ফুল' নিয়েও চিন্তাভাবনা করতে পারে"। —সত্যিই পারেন ? যদি পারতেন তবে শ্রমবিভাগ এবং তজ্জনিত ব্যবধান একটা কাল্পনিক সত্য হ'ত, বাস্তব সামাজিক

সত্য হত না এবং তা সৌমেন কর্তৃক উদ্ধৃত মার্কসের উক্তিটির বিরুদ্ধেই যেত (তাঁর আশা অনুযায়ী), স্বপক্ষে যেত না। বক্রোক্তি'র ঝোঁকে সৌমেন খেয়াল করেন নি যে ঐ উক্তিতে মার্কস (শ্রেণীহীন অতীত ও অনাগত ভবিষ্যতের) যে মানবিক সম্ভাবনার কথা বলেছেন সে সম্ভাবনা প্রচলিত শ্রমবিভাগ সত্য হতে দিচ্ছে না। একই কারণে U.G.C'র মোটা মাইনেওয়ালা অধ্যাপকদের হঠাৎ মোটা মাইনে বন্ধ করে দিয়ে পর্ণ কুটির ও চাষের জমিতে ছেড়ে দিলে দেশে দুর্ভিক্ষ লেগে যেতে পারে।

তবে তাঁর অন্যমনস্কতা এই নির্দোষ কৌতুককর চরিত্র হারায় যখন তা প্রতিবেদনের বক্তব্যের বিকৃতি ঘটায়। যেমন :

(1) তিনি খেয়াল করেন নি ঐ প্রতিবেদনে "এত কথা" যা কিছু আছে তা "নগণ্য একটা পরীক্ষার" বৈজ্ঞানিক লাভ নিয়ে নয়। ঐ পরীক্ষাটি তেমন আরও অসংখ্য পরীক্ষা নিয়ে তৈরী যে কার্যক্রমের অতি ক্ষুদ্র একটি নমুনা, তারই বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা নিয়ে।

(2) তাঁর খেয়াল হয়নি যে "একলব্যে"র কর্মী সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে আমার অসম্পূর্ণ প্রতিবেদনে কোন কথা ছিল না। অনুসন্ধান ছাড়াই ধরে নিয়েছেন "একলব্য বা তার অংশগ্রহণকারীরা আজ সংগঠক (বা শিক্ষক) হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন মূলতঃ 'মার্কশীট' ও 'সোর্স' পুঁজির ভিত্তিতেই।"

এ ছাড়াও আরও নানা মৌলিক মন্তব্য আপ্তবাক্যের ভঙ্গীতে তাঁর চিঠির নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, যাতে মেকী জিনিষের প্রতি তাঁর দৃপ্ত ঘৃণা ও মেহনতী মানুষদের প্রতি গভীর অনুরাগ শ্রদ্ধা উদ্রেক করে! যেমন :

(1) তাঁর মতে 'একলব্য' বা অন্যরা যে "জনগণের মধ্যে 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' আনতে চাইছে" তাতে "সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার মূল সমস্যা তুলে ধরার বাধাই···সৃষ্টি করা হবে", কারণ, "বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কী a priori আমাদের সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানসিকতা নয়?" কে কি চাইছেন সেকথা ছেড়ে দিলেও "বৈজ্ঞানিক মানসিকতা"র এই অপূর্ব বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা সেই সুবিধাভোগী শ্রেণীর সদস্য হিসেবে তিনি যে বুঝতে পেরেছেন এতে তাঁর হয়তো সাধুবাদই প্রাপ্য।

(2) মেহনতী মানুষদের প্রসঙ্গে তিনি "একেবারেই a priori মননশীলতা বা ধারণা না নিয়ে" "প্রত্যক্ষ গভীর যোগাযোগের" প্রস্তাব দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি তো অত্যন্ত সুপ্রস্তাব, যদিও ঐ প্রতিবেদনে এর বিরোধী কোন কথা আছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু তাঁর গোটা চিঠিটাই যে "apriori" ধারণায় ভর্তি সে কি তিনি অমেহনতীদের শিক্ষাদান করার চেষ্টা করেছেন বলে?

"সব শেষে" তিনি বলেছেন "কতগুলি দৃষ্টিভঙ্গীর তর্ক তুলে সমালোচনার উদ্দেশ্য আমার নেই।" তাহলে কিসের "তর্ক তুলে" তিনি তাঁর আক্রমন চালিয়ে গেলেন? সুকুমার রায়ের 'চলচিত্ত চঞ্চরী' নাটকে সাম্য-সিদ্ধান্ত সভার সভ্য উত্তেজিত সত্যবানের উক্তি মনে পড়ছে—"উত্তেজিত ভাবে কোন প্রসঙ্গ করা আমাদের রীতি নয়।"

তাঁর গালমন্দের কুয়াসার ফাঁকে ফাঁকে আপ্তবাক্যগুলি ছাড়া শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর আর যা পরিচয় পাওয়া যায় তা (আমি যতটা বুঝেছি) এই রকম :

(1) কৃষকদের জন্য রুজিনির্ভর অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থার তিনি পক্ষপাতী। যদিও ঐ প্রতিবেদনের প্রসঙ্গে এ আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়, এবং এ ব্যাপারে শোনার বাইরে আমার কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই তবু সাধারণ বুদ্ধি থেকে মনে হয় তাই হওয়া উচিত।

তবে আক্ষরিক অর্থে শিক্ষকের অনস্তিত্ব বাস্তবোচিত চিন্তা বলে মনে হয় না। একই ব্যক্তি শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ভূমিকায় থাকতে পারে। স্থায়ীভাবে নামাকরণটা অবশ্য আবশ্যিক নয়। শিক্ষকের অস্তিত্ব নয়, শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ত্রুটিই স্ব-নির্ভরতার পথে প্রধান বাধা। আমাদের দেশে ব্যাপকতম শিশু ও কিশোরদের দ্রুত শিক্ষার মাধ্যমও যে একমাত্র অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাই হতে পারে এতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বয়স্ক শিক্ষার অবিকল প্রতিরূপ অবশ্যই হতে পারে না। এসব পাঠ্যক্রমে পরিস্থিতি অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়বস্তু'র কোন দিকের উপর কোথায় কিভাবে জোর পড়বে তার আগাম নক্সা তৈরী করার চেষ্টা অবাস্তব। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা (যেমন 'প্রাণের বিকাশ') "বাস্তব বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি"র (যেমন 'পোলট্রি') এবং "বিজ্ঞান-শিক্ষণকে গাঁয়ের জীবন ও পরিবেশের সাথে জুড়বার" পথে কোন বাধা তো নয়ই বরং তার পরিপূরক। গোড়া থেকেই রুজির জন্য ভাবতে হবে বলেই কৃষক শিশুকে বিজ্ঞানের এই সব মূল্যবান সাধারণীকৃত ধারণার থেকে বঞ্চিত রাখার কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না—"প্রাণের বিকাশ" নিয়ে সৌমেনের রঙ্গ ব্যঙ্গ সত্ত্বেও না।

(2) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থার সমর্থনে সৌমেনের আপাত বিদ্রোহী সুর আমার কাছে খুবই কৃত্রিম ঠেকল। তিনি

যদি দাবী করতেন লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে কর্তাদের এই সব কর্ম চালিয়ে যেতে হবে, তবু তাঁর চড়া সুরের একটা মানে বোঝা যেত। অন্যদিকে তাঁরই প্রস্তাবিত পথে কম বেশী চলা সত্ত্বেও মার্কশীট নির্ভর ফলাফলের (যার জন্য তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত) অবস্থাটা খুব ভাল কী? "সোর্স" পুঁজি সংগ্রহে সবাই যে সমান ভাবে সমর্থ হয় না তার কারণ ঐ পুঁজির বাজারে সব সময়েই মন্দা চলছে—অজ্ঞতা তার প্রধান কারণ নয়। মাষ্টার মশইরা এ বিষয়ে কিছু বিশেষজ্ঞ নন। কাজেই এ বিষয়ে ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিতে তাঁরা সবাই যদি সমান ভাবে উৎসাহী না হন তবে এই কারণে বোধ হয় ভণ্ডটণ্ড বলা ঠিক নয়। ভণ্ডামী ব্যাপারটা অনেকটা পেটব্যাথার মত—প্রমাণ করা ভারী শক্ত। আমার বা সৌমেনের চিঠিও যে ভণ্ডামী নয় সেটা অন্যকে ভণ্ড বলে গাল পাড়লেই প্রমাণ হবে না। বৈজ্ঞানিক চেতনা বা জ্ঞান ভাল ফলাফলের বাধা স্বরূপ তাঁর অনুক্ত কিন্তু স্পষ্ট ধারণার সাথেও অভিজ্ঞতা থেকেই একমত হওয়া গেল না। কাজেই সেই বাবদে "অল্প বয়সী"দের "প্রতিযোগীতায় দুর্বল" করে দেবার আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক। অন্যদিকে "অল্প বয়সীদের" সাথে নাচিয়ে পুতুলের মত (যেমন "কোন বিষয় দুর্বোধ্য বা বোধ্য রেখে মুখস্ত করান" ইত্যাদি) ব্যবহার করার প্রস্তাব তাঁদের পক্ষে অমর্যাদা করা। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করার এই প্রস্তাবের সাথে একমত হওয়া গেল না।

(3) "একলব্য রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল্যবান ও সুবিধাভোগী" সংগঠন হয়ে উঠতেই পারে, ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করা অর্থহীন। আমি বা সৌমেন যে সুযোগ বা ক্ষমতা পেলে ঐ একই কাঠামোর সুবিধাভোগী ব্যক্তি হয়ে উঠব না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কোন কিছুরই গতকাল বা আজ তার আগামীকাল সম্পর্কে সংশয়াতীত নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এই কারণে আজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংগঠনের কাছ থেকে শিক্ষণীয় কিছু থাকলে তা না শেখার কোন যুক্তি নেই।

(4) "একলব্য পরিচালিত অনুষ্ঠান"-এর ফলে "প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী জমিতে কর্তৃত্ব করবে" —প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেবার উপায় কী? অল্প-বয়সী ছাত্রছাত্রীরা যাতে আনন্দময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সঠিক বৈজ্ঞানিক চেতনায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে না পারে (অর্থাৎ যা চলছে) তাকেই আরও সুনিশ্চিত করা? একই যুক্তিতে আজকের শোষনভিত্তিক শিল্প বা কৃষিব্যবস্থাকে দুর্বল করার পথ হচ্ছে শ্রমিক বা কৃষকদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বোধ, জ্ঞান বা দক্ষতাকে অর্জন না করতে উৎসাহ দেওয়া? জানি না, এই আত্মঘাতী নীতিকে কোন বিভ্রমবশতঃ তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক অন্তর্ঘাত বলে মনে হ'ল।

সৌমেনের যেসব সমালোচনা বা আক্রমণ আমার কাছে ভ্রমাত্মক, বিভ্রান্তিকর, ভিত্তিহীন ও অপবাদমূলক বলে মনে হয়েছে তারই আলোচনার চেষ্টা করলাম। তার মানে এ নয় যে "একলব্য" সংস্থার সমস্ত কর্মকাণ্ড বা ঐ প্রশিক্ষণ শিবিরের কোন কিছু নিয়ে আমার সংশয় নেই। ঐ প্রতিবেদনেই একথা বলা ছিল। বি-ও বির কর্মীরা ও পাঠকরা চাইলে তা নিয়ে ভবিষ্যতে অনায়াসেই আলোচনা হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে আলোচিত প্রতিবেদনের কোন ইতিবাচক দিকগুলির উপস্থাপনা বা সংশয়গুলি সম্পর্কে সম্ভাব্য ভবিষ্যত আলোচনার উদ্দেশ্য সংস্থাবিশেষের গুনগান বা নিন্দা কোনটাই নয়; যদি সেই অভিজ্ঞতা আমাদের কোন কাজে লাগে, এই মাত্র। লাগে ভাল, না লাগে তো লাগল না।

"কোনা বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থাহীন প্রগতিশীল আন্দোলন" হয় কিনা সে বির্তকে এখানে যাবার জায়গা নেই। কিন্তু তেমন কোন আন্দোলনের পুর্নাঙ্গ রূপরেখা উপস্থাপনের দাবী ঐ প্রতিবেদনে কোথাও নেই। প্রতিবেদনের উপজীব্য বিষয় অত্যন্তই সীমীত ছিল—নিয়মিত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিশু ও কিশোরদের পক্ষে উপযুক্ত বিজ্ঞান-শিক্ষণ-পদ্ধতি। অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক এই লেখার অভিজ্ঞতার আশু ক্ষেত্রটি যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আলোচনায় তারও প্রতিফলন ঘটেছে। নইলে সেই ব্যবস্থার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন সওয়াল করা হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সৌমেন মূল উপজীব্য বিষয়ে ভাল মন্দ কোন কথাই বলেন নি। সেই দিক থেকে তাঁর গোটা চিঠিটাই অপ্রাসঙ্গিক। স্পষ্টতই উদ্যোক্তরা ঐ কাঠামোর মধ্যেও অভিপ্রেত পরিবর্ত্তনের আশা রাখেন। সেই আশা বা বিশ্বাস কতটা বাস্তবোচিত সে সম্পর্কে আমিও নিঃসংশয় নই। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসকে "বিপজ্জনক" আখ্যা দেওয়া যেত যদি তাঁরা এর বাইরের অন্য সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টার বিকল্প হিসেবে এটাকে রাখতে চাইতেন। তেমন কোন কথা আমি শুনি নি। কাজেই সৌমেনের "আতংক"গ্রস্ত হবার কোন কারণ দেখছিনা—"খারাপ" লাগারও না। বরং তাঁর পরমত অসহিষ্ণুতাটা ("কোন ভন্ডামীর নামেই এই আন্দোলন চলতে দেওয়া যায় না") সত্যিই পীড়াদায়ক।

বি-ও-বি কেন পড়বেন

গত জুলাই-আগস্ট '86 সংখ্যা বি-ও-বি'র চতুর্থ কভারে একটি বিজ্ঞাপন ছিল—বি-ও-বি-র নিজের বিজ্ঞাপনঃ **বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-কর্মী কেন পড়বেন**। অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটি—টের পাওয়া গেল। তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কেউ কেউ খুশি। দু চারজন দুঃখ পেয়েছেন—এমন বাজারী আচরণে। আরো অভিযোগ—'বি-ও-বি' যা নয় তাও দাবী করেছে।

এসব বিতর্ক শুনে এক বন্ধু এগিয়ে এসেছেন বিকল্প একটি বিজ্ঞাপনের খসড়া নিয়ে। এই সংখ্যাতেই সেটা বিজ্ঞাপন হিসেবে ছাপতে শঙ্কা হল—পাছে ফের বিতর্কে জড়াতে হয়। তাই মাঝামাঝি রফা হল। প্রস্তাবটি খসড়া আকারেই রাখা হচ্ছে আপনাদের দরবারে—মতামতের জন্য!

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর পক্ষে সওয়াল

এক বি-ও-বি আগামী দিনের সমাজ ও বিজ্ঞান নিয়ে ভাবতে, ভাবাতে চায়। যার অংশীদার হলে আজকের দিনের সমাজ ও বিজ্ঞান নিয়ে আপনাকে আর ভাবতে হবে না।

দুই বি-ও-বি পড়লে আপনি নিজের ও অন্যের কাছে একজন বিজ্ঞান-কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন। যেটা আজ বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার চেয়েও বড় কথা।

তিন আপনি যদি বি-ও-বি পড়েন (যদি সত্যিই পড়েন) তবে আপনি এক বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হবেন। আমরা গর্ব করে বলতে পারি, পৃথিবীতে বি-ও-বি-পড়া লোকের সংখ্যা খুব কম। এমন কি আমাদের প্রুফ রীডারও এ কৃতিত্ব পুরোপুরি দাবী করতে পারেন না। **জানেন কি?**—সারা দুনিয়ায় যত জন জীবিত নোবেল পুরস্কার বিজেতা রয়েছেন বি-ও-বি'র পাঠক সংখ্যা তারও কম।

চার বি-ও বি হালকা অথচ টেঁকসই। একে যে কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়ে পড়া যায়, পড়তে পড়তে যে কোনো জায়গায় যাওয়া যায়।

পাঁচ বি-ও-বি সারা বিশ্বের সমস্যা নিয়ে ভাবে। এর ফলে আপনি—বি-ও-বি'র পাঠক—একজন প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী বিশ্ব-নাগরিক হয়ে উঠছেন। আর, এই অতিরিক্ত সুবিধাটুকু আপনি পাচ্ছেন কোনো বাড়তি মূল্য না দিয়েই—আপনার নিজের ঘরটিতে বসে—একমাত্র বি-ও-বি'র কাছ থেকে।

ছয় বি-ও-বি প্রতিবাদের কাগজ—বি-ও-বি এসটাবিলিশমেন্ট-এর নয়। এস্‌টাব্‌লিশমেন্ট থেকে যদি অর্থসাহায্য, অনুদান, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি পাওয়া যায় তবে তা প্রত্যাখ্যান করতেও বি-ও-বি'র ঘৃণা হয়। তাই বি-ও-বি তা গ্রহণ করে। এই বলিষ্ঠতার শরিক ও সহযাত্রী আপনি অবশ্যই হতে চাইবেন—বি-ও বি পড়ে, বি-ও-বি পড়িয়ে। □

With best compliments from :

S. K. SINGH ROY

8/6 CENTRAL PARK
Calcutta-700 032

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পুরনো সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর 1984

বায়োটেকনোলজি : নয়া সুজন্মবাদের শুরু—অভিজিৎ লাহিড়ী □
রক্ত বচে রুজি, রক্ত থেকে পুঁজি—অসীম চট্টোপাধ্যায় □
বাংলা বিজ্ঞান সাময়িকী—রবীন মজুমদার □

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1985

ভূপালের আলোয় প্রযুক্তির বিচার : ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান বনাম জনবিজ্ঞান—মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার □
প্রিয় ডক্টর ভরদারাজন—অনীল সদ্‌গোপাল, এ কে রায় □
ভূপালের ডায়েরী—চিকিৎসাচিত্র—ডাঃ সুজিত কুমার দাশ □
ভূপাল দুর্ঘটনা, কলকাতার কার্বাইড ও মালটিন্যাশনাল মেজাজ—রবীন চক্রবর্তী □

মার্চ-এপ্রিল 1985

প্রযুক্তি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ—কৌশিক বন্দোপাধ্যায় □
বিজ্ঞানের ইতিহাস : অন্য ছবি—অভিজিৎ লাহিড়ী □
সবুজ বিপ্লব : ধান চাষের একটি সমীক্ষা—প্রদীপ দত্ত ও ধ্রুবজ্যোতি দে □
জনস্বাস্থ্য বনাম কীটনাশক—সুব্রত শীল □
স্বাস্থ্য ওষুধ মানুষ—ডাঃ সুজিত কুমার দাস □

মে-জুন ও জুলাই-আগস্ট 1985

ঘরের কাছে দূষণ কেশোরাম রেয়ন—শান্তনু ত্রিবেদী □
বায়োটেকনলজি— এদেশে—গৌতম ব্যানার্জি □
জনৈক বিজ্ঞানীর অন্তিম নিবেদন—(অনুবাদ) পার্থ সেন □
তরোয়াল থেকে কাস্তে, লিউকাস এয়ারোস্পেসের অভিজ্ঞতা—মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার □
লুকাস এয়ারোস্পেস—নতুন অভিজ্ঞতা নতুন সম্ভাবনা—সুরঞ্জন কর □
মিনামাতা—পার্থ সেন □
বিজ্ঞানের ইতিহাস : অন্য আরেকটি ছবি—লতিকা গুহ □

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1985

পারমাণবিক অথবা মানবিক ভারত—সৌমেন গুহ □
পরমাণু বোমার মানসিকতা—ভারতে—রবীন মজুমদার □
শিল্প বিকাশ ও উন্নয়নের ফল—সিঙ্গরৌলী, অনুবাদ—প্রদীপ দত্ত □
ডেনমার্কের নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলন ও সফলতা □

নভেম্বর-ডিসেম্বর 1985

গ্যাস আর ছাইয়ের কবলে খড়দহ-টিটাগড়—শান্তনু ত্রিবেদী □
ভূপালে চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তোলার লড়াই—পুণ্যব্রত গুণ □
বিজ্ঞানের সীমা—(অনুবাদ) সুরঞ্জন কর □
রহড়া বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ কি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের—পার্থ সেন □
হাত বাড়ালেই ওষুধ—স্মরজিৎ জানা □

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1986

ভূপাল যেদিন হ'ল এবং তারপর—শিবপ্রসাদ নিয়োগী
করকে দেখা সমঝ গয়া—সুভাষ গাঙ্গুলী
বিজ্ঞানচর্চার এদেশ ওদেশ—স্বরূপ গুপ্ত □
জন্মশতবর্ষে, নীলস বোর স্মরণে—সুব্রত ভট্টাচার্য্য □
ক্যানসারের প্রতিকার : কষ্টকল্পনা বনাম বিজ্ঞান—ভাস্কর মৈত্র, সুকুমার সাহা □
কার স্বার্থে বেবিফুড—স্মরজিৎ জানা □

মার্চ-জুন 1986

ভারতে পারমাণবিক শক্তি, (অনুবাদ)—সুপর্ণ চৌধুরী □
করকে দেখা সমঝ গয়া—সুভাষ গাঙ্গুলী □
খরা : সমীক্ষা-প্রশ্ন-ভাবনা—প্রদীপ দত্ত □
বিজ্ঞানযাত্রা ছিয়াশী—সুদীপ্ত রায় বর্মণ, শিবপ্রসাদ নিয়োগী □
রাসায়নিক কারখানার দূষণ এবার সুন্দরবনে—সৌমেন গুহ □
অস্তি-নাস্তি—স্বরূপ গুপ্ত □
হিন্দুস্তান হেভি ক্যামিক্যালস্—শান্তনু ত্রিবেদী, পার্থ সেন □
নিউক্লিয়ার প্রশ্ন—রবীন চক্রবর্তী □

জুলাই-আগস্ট 1986

কমপিউটারের অন্য দিক—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার □
প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি—রবীন মজুমদার □
খরা ভাবনা—প্রদীপ দত্ত
ভূপাল মামলা—রবীন চক্রবর্তী
দূষণ সমীক্ষা—পার্থ সেন
চের্নোবিল—সুপর্ণ চৌধুরী

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1986

নক্ষত্রলোকে যুদ্ধ—রাজকুমার গাঙ্গুলী ও পার্থ সেন □
স্টার-ওয়ার্স প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের প্রতিবাদ—সুপর্ণ চৌধুরী □
খাদ্যব্যবসায়ীর কোপে ক্রান্তীয় বনাঞ্চল—অনুবাদ শিবপ্রসাদ নিয়োগী ও সুরঞ্জন কর □
কার্বন ডাই সালফাইড দূষণ—অরবিন্দ দাশ □
সুন্দর বনে সারকারখানা—শান্তনু ত্রিবেদী □
ছেলেমানুষী—স্বরূপ গুপ্ত □

R.N.34929/79

YEAR 10 NUMBER 3

A Bi-monthly Magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o D. S. Enterprise,
52/9C, B. B. Ganguli Street, Cal-12
Nov.-Dec. 1986

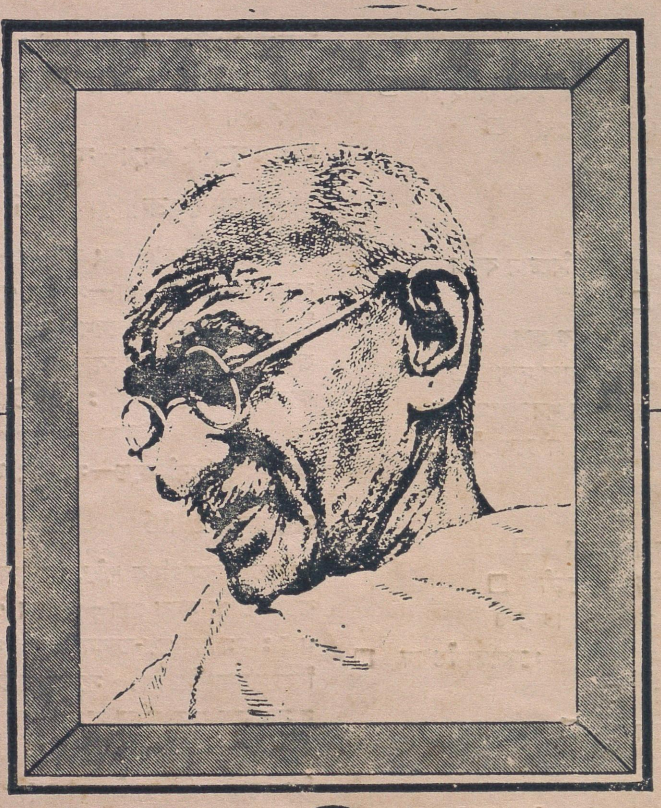

মহাত্মাজীর ধর্ম

"আমার ধর্ম কোন ভৌগলিক সীমার মাঝে
আবদ্ধ নেই। আমার ধর্মের ভিত্তি হল ভালবাসা
এবং অহিংসা। আমার ধর্ম কাউকে ঘৃণা
করতে শেখায় না।
ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে নয়—
তা শেখায় সকলকে ভালবাসার বন্ধনে বাঁধতে।"
এটাই ছিল মহাত্মাজীর ধর্ম

ভালবাসা এবং সহনশীলতার প্রকৃত ধর্ম

davp 86/229 ben

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, 15/সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-9, হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।